পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
নূতন সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২
দাম : ১০ টাকা

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশিকা : মাধুরী দত্ত, ৪এ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলিকাতা-১০।
মুদ্রক : শ্রীসুধাতোষ বসু, ইম্প্রেশন. ৩৩বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬।

গৌরভক্তগণের করকমলে

—গ্রন্থকার

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

"চৈতন্যচরিতামৃতের" পদাঙ্ক অনুসরণে মহাপ্রভুর 'নীলাচল লীলা' ধারাবাহিকরূপে সঙ্কলন করা আমাব বহু দিনের ঐকান্তিক বাসনা। "চরিতামৃত"—অমৃতের খনি. বসের সাগর। তাহাতে যে অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে, তাহা সংগ্রহেব চেষ্টা কবা আমাব মত অনধিকারীর পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। বিশেষতঃ গৌরভক্ত ৺শিশিরকুমাব ঘোষ মহাশয়ের অপূর্ব গ্রন্থ "অমিয় নিমাইচরিতের" পব গৌরলীলার কোন অ শ নতন অবয়বে প্রকাশ কবা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে। কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও এই সঙ্কলনের কার্য হইতে বিরত হইতে পাবি নাই। ইহাতে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। একদিন্ পুণ্য প্রভাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম লইয়া আমি এই সঙ্কলন কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। আর আজ তাহাবই নাম লইয়া ইহা শেষ করিলাম। আদৃত বা অনাদৃত হওয়া তাঁহাব ইচ্ছা। ইহা পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ লাভ করেন, তাহাতে আত্মপ্রসাদ লইবার অধিকারও বুঝি বা আমার নাই। 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-এর অধিকাংশ 'উপাসনা' পত্রিকায় 'নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। *

গ্রন্থকার

* [১৩৩৩ বৈশাখে পিংনা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে] ।

ভূমিকা

গ্রন্থকার আমার পিতৃদেব। তিনি ব্যবহারিক জীবনে উকিল ছিলেন। মনে হয় সে শুধু বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া। পার্থিব জীবনে জীবিকার জন্য কিছু একটা করিতে হয় তাই।

তিনি বঙ্গভাষা ও ইংরাজী ভাষা সাহিত্যে দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। ইংরাজী প্রবন্ধ, সংবাদ পরিবেশক রূপে দীর্ঘকাল অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহা ব্যতীত আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হইবার পর হইতেই আমি পিতৃদেবকে দেখিয়াছি জ্ঞানপিপাসু, একজন সার্থক তত্ত্বান্বেষীরূপে। দেশী ও বিদেশী শাস্ত্র ও সদ্‌গ্রন্থাদির মাধ্যমে তিনি তত্ত্বান্বেষণে রত ছিলেন। এই তত্ত্ব অন্বেষণ তাঁহাকে জীবনের মহৎ ক্ষেত্রে উত্তরণে সহায়তা করিয়াছে। মহান্ প্রেরণায় ভক্তিপথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

জ্ঞান ও কর্মই ছিল তাঁহার জীবনবেদ। বিষয়-ব্যসনে অনাসক্ত ছিলেন তিনি। তবে কর্তব্যে কখনও কোন সময়ে তাঁহাকে উদাসীন থাকিতে দেখি নাই। লোকশিক্ষা হেতু মহাপ্রভুর উক্তি—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।

পিতৃদেবের জীবনে ইহা বাণীরূপ লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

একদা তিনি পুণ্য প্রভাতে এক 'অজাত অক্ষয় অন্তঃ পুরুষে'র অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া বর্তমান সঙ্কলন কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ব্রতের ফলস্বরূপ "নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" আজ ধর্মপ্রাণ গৌরভক্তজনের কাছে যে রকম আদৃত হইয়াছে তাহাতে এই আশা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয় যে, অন্নগত প্রাণ ক্ষণভঙ্গুর জীবন-সর্বস্ব মানব-সমাজে ধর্ম আজিও নিষ্প্রভ হয় নাই, উপরন্তু তাহা নিজ প্রভায় প্রজ্জ্বোল, স্ব-মহিমায় দেদীপ্যমান।

পিতৃদেব 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থখানির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক 'লিটারারি পেন্‌শন্' লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা ভক্তের হৃদয় লইয়া গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের শিল্পনৈপুণ্য এবং বাচনপদ্ধতি সুপ্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। উপরন্তু চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থাদি হইতে যে শ্লোকগুলি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলির নির্বাচনে নিপুণতা দেখা যায়। স্বল্প কথায় উদ্দিষ্ট ভাবটি খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাক্‌সংযম আত্মশোধনের একটি অন্যতম পথ।

গৌরলীলা 'কোটি সমুদ্র গম্ভীর'। বাঙ্গালী হিন্দুর সর্বস্ব সম্পদ। সাধনার ধন। সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী।

গৌরাঙ্গদেব মূর্তিমান প্রেম। ভক্তি ও প্রেমের খনি গৌরাঙ্গদেবের জীবন-তত্ত্ব, সাধনসামগ্রী, ভজন-পদ্ধতি, নামসংকীর্তনানন্দে কৃষ্ণভাবিত মতি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তনু—অপামর জন-গন-মানসে একটি নূতন দ্বার, একটি দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়া বিষয়-মলিন মনকে তীব্র টানে প্রাকৃত রৌরব হইতে অপ্রাকৃত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার তত্ত্বের সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে সর্বধর্মসার মহাগ্রন্থ গীতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত যে মহাবাণী যুগে যুগে হিন্দু জাতিকে দুঃখ দৈন্য শত লাঞ্ছনা-নির্যাতনের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, ম্রিয়মান স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সর্বসময় অটুটভাবে যা বরণ করিয়া নিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে সেই মহাবাণী আমাদের অকুণ্ঠিত ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

বায়ুপুরাণে পাওয়া যায়—

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর বিগ্রহঃ ॥

কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে ও কলির প্রারম্ভে লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ গৌর মূর্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথসমীপে অবস্থিতি করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মবিপ্লব হিন্দুসমাজ ও ,দেশকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে বিপ্লবে হিন্দু নরনারীর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। শাশ্বত ধর্মতত্ত্ব ম্রিয়মান মানব-মন হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া সেখানে ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসা, পরনিন্দা, পরপীড়ন মানব-মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। হিন্দু ধর্মপন্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহ্যিক নীরস ও শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। গৃহে গৃহে নিরানন্দ বাণী উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া তুলিত।

কৃষ্ণ ভক্তি কি তা কেউ জানিত না। জানার কোন প্রয়োজনও রাখিত না। ভক্তি চর্চা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল।

ধর্ম জীবনের এই নিদারুণ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবকে যুগধর্মে প্রণোদিত করিতে রমণীয় ভাগীরথীতটে বিদ্বজ্জন মুখরিত জ্ঞান ও ধর্মের পুণ্যভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন।

মহাপ্রভুর জন্মসময়টাই বা কী মনোরম!

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। পথঘাট, মন্দিরশীর্ষ রজত ধারায় প্লাবিত, শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ধরাতল হাস্যোজ্জ্বল। চতুর্দিক চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত, সহস্র বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়া মাতা সুরধুনী কলকল ছলছল তরঙ্গ-পুলকে প্রবাহমানা।

ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥

হরি হরি বলে লোক হরসিত হঞা।
জন্মিলেন চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥

(চৈঃ চরিত)

মহাপ্রভুর জন্মসময় সর্বসুলক্ষণযুক্ত।

সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ॥

(চৈঃ চরিত)

চতুর্দিকে হর্ষধ্বনির মধ্যে মিশ্রালয়ে দেবশিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী সংবাদ পাইয়া মিশ্রালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং

লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে॥ (চৈঃ চরিত)

মহাপ্রভুর বাল্য, কৈশোর ও মধ্যলীলায় যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে দেখা যায় সে সমস্ত ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়া আমরা তাঁহার ভগবত্তা স্থাপন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

ভক্তিপ্লুত তৈর্থিক সন্ন্যাসীর ভক্তিবিধৌত অন্তরের নিবেদিত অন্ন সকলের অলক্ষ্যে ইষ্টদেবকে নিবেদন করার পূর্বেই চঞ্চল নিমাইয়ের ভক্ষণ, তস্করদ্বয়ের বালককে অপহরণ এবং বিভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্বার মিশ্রালয়ে প্রত্যাবর্তন, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণকালে কুর্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিপ্র বাসুদেবকে রোগমুক্ত করা,—

প্রভুর স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল॥

মধ্যলীলায় মহাপাপী জগাই-মাধাই উদ্ধার, পাপীর শিরশ্ছেদ করিয়া ধর্মের মহিমা প্রচার করার জন্য সুদর্শনচক্র আহ্বান এবং বিষ্ণুচক্রের দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দ্রুত অবতরণ, গঙ্গাবক্ষে মন্ত্রপূত জাহ্নবীবারিসহ জগাই মাধাইয়ের জীবনব্যাপী পাপ কর্মের ফল নীরব অশ্রুতে অর্পণ করা এবং ক্ষণিকের জন্য মহাপ্রভুর প্রেমকান্তি কালিমাবর্ণ ধারণ করা প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ দ্বারা মহাপ্রভুর অবতারতত্ত্ব স্থাপন করার আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি।

মহাপ্রভুর অবতারবাদ এত শিথিল ভক্তির উপর সংস্থাপিত নয়। অলৌকিক ঘটনা সে লীলার অতি গৌণকর্ম। সেগুলি লীলা হইতে বাদ দিলেও তাঁহার ভগবত্তা কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাহা সমস্ত যুক্তিতর্কের ঊর্দ্ধে।

ভারতের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস লইয়া স্থায়ীভাবে নীলাচলে বাস করিবার জন্য গমন করার অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাকে 'পুরুষ পুরাণ' বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রমেয় পাণ্ডিত্য, অমানুষী মনিষা, কৃষ্ণরস-ভাবিতমতি, লাবণ্য ঢলঢল গৌরকান্তি, আর্তি, ক্রন্দন, অপরূপ নৃত্যের মধুরিমা এবং অশ্রু, কম্প ইত্যাদি অষ্ট সাত্বিকী ভাবে ভূষিত মহাপ্রভুর প্রেমকান্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনরূপে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র ইষ্টদেব উপাস্য জ্ঞানে দৈনন্দিন বৈষ্ণব জীবন অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচী-সুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম ॥

ভারতের সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক সোঽহম্‌বাদী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি কাশী নগরীতে বাস করিয়া দশ সহস্র তেজস্বী শিষ্যকে নিয়ত বেদান্ত শিক্ষা দিতেন এবং মহাপ্রভুর নবদ্বীপে আবির্ভাব কালে তাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গ্লানিসূচক দুই একখানি লিপিও তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু বৃন্দাবন পথে বারানসীধামে উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেবকে একমাত্র ঐন্দ্রজালিক সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করিয়া শিষ্যগণকে তাঁহার সংস্পর্শে যাইতে বারণ করিয়াছিলেন, সেই গর্বিত বৈদান্তিক মহাপ্রভুর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া বিন্দুমাধব অঙ্গনে দিগন্তপ্লাবী হরিধ্বনির মধ্যে প্রেমাশ্রু প্লাবিত প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুর নৃত্যের ভঙ্গিমা ও মধুরিমা দর্শনে একদিন তিনিই তাঁহার ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন।

তৎকলে অমিত প্রতাপশালী হিন্দু নরপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র যিনি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান রাজা হোসেন শাহের কবল হইতে সমগ্র উৎকলভূমি উদ্ধার করিয়া হিন্দুর বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং যিনি সন্ন্যাসীর রাজদর্শন

নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে একদিন আবেগভরে বলিয়াছিলেন—

তার প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥

সেই সর্বজনবরেণ্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভুকে ভগবানকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উপাস্যই ছিল না।

সার্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, মহারাজ প্রতাপরুদ্র সকলেই পুরুষ পুরাণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষান্তে সর্বতোভাবে স্বয়ং ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লীলা আলোচনায় দেখা যায়, মহাপ্রভুর প্রতি কার্যে, প্রতি পদক্ষেপে উৎফুল্লা বসুন্ধরা রোমাঞ্চিতা। কোটি কোটি ভক্ত তাঁহার প্রেমদুর্লভ কান্তি দর্শনে তাহাদের মলিন রসনায় হরিনাম লইয়া ধন্য হইতেছে। প্রেমাবতার মহাপ্রভু যেখানেই উপস্থিত হইয়াছেন বিদ্যুৎগতিতে সে সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে এবং তাঁহার সুমধুর নৃত্য ও কীর্তন শুনিয়া অশ্রুনীরে ভাসিতেছে। দিবস রজনী গৃহ-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র পরিবার, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই দেবদুর্লভ সঙ্গলাভ করিবার জন্য উন্মুখ আনন্দে আত্মহারা হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

মহাপ্রভুর ভগবত্তার অকাট্য প্রমাণ তাঁহার মধুর হইতেও মধুর হৃদয়-দ্রবকারী লীলা যাহা "শ্রবণে মধুর কীর্তনে মধুর" তাহা "স্বমাধুর্য্যে সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ"। সে লীলার স্তরে স্তরে প্রেমবন্যা স্বতঃ উৎসারিত।

মহাপ্রভু যুগধর্ম প্রবর্তক। কলিহত জীবকে যুগোপযোগী ধর্মশিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব।

কলিযুগ দোষনিধি। অন্নগত প্রাণ, ক্ষণভঙ্গুর দেহ, রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্যে ক্লিষ্ট কলির জীবের পক্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের সুমহান্ যাগ-যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্মপ্রণালী প্রযোজ্য নয়। তাই ভগবান তাঁহার জীবকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য নবধর্ম প্রচার করিলেন।

নামে বিবেক বাতাস খেলে,
নামে ভক্তি রতন মিলে,

নামাভাসে পাপরাশি হইবে বিধৌত।

নাম বিনু কলিকালে নাহি ধর্ম আর।

শুধু প্রচার নয়, মহাপ্রভু নিজে সে ধর্ম আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন।

ভগবান প্রেমময়। তিনি জীবের সুহৃদতম। তাঁহার মত বন্ধু জীবের আর কেহ নাই। বিমূঢ় জীব লক্ষভ্রষ্ট হইয়া ধর্মের পিচ্ছিল পথে চলিতে পারিতেছে না। তাই তাঁহার এই নবধর্মের প্রচার।

এই যে মহাপ্রভুর দর্শনমাত্র কল্লোলিত জনস্রোত আনন্দতরঙ্গে ভাসমান হইতেছে, যে আনন্দ দিনের পর দিন তাঁহাকে ভাবতন্ময় করিয়া রাখিয়াছে এ. সমস্তই তাঁহার ঈশ্বরত্বেরই সম্যক্ পরিচায়ক।

ভগবান প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবন। তাহা হইতেই আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া জীবকে ভাসাইয়া লয়। হ্লাদিনী শক্তি তাঁহারই প্রধানা শক্তি। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। এই হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপ শক্তির পুঞ্জীভূত রূপই হইলেন গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা।

লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভুকে দেখিয়া যে পরমানন্দে আপ্লুত হইতেছে, কোন দেহধারীকে দেখিয়া অন্য দেহধারী এমন অফুরান আনন্দে অভিভূত হইতে পারে না।

লীলার স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, গদাধর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি তাঁর মর্মীভক্ত ও সহচরগণ মহাপ্রভুর দূরদেশ গমনের উদ্যোগে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকায় মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। ইহা লীলা লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়। ইহা বাস্তব ঘটনা।

দেহ হইতে আত্মার পরিমুক্ত অবস্থায় জীবের যে গতি হয়, মহাপ্রভুর অদর্শন জনিত তাহাদেরও সেই গতি হইত। ইহা সাধারণ জীবের দেহধর্মের লক্ষণ নয়। একমাত্র শ্রীভগবান ব্যতীত জীবের এমন অবস্থা কেউ ঘটাইতে পারে না।

মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সন্দিহান বিজ্ঞ পাঠক একবার স্থির চিত্তে মহাপ্রভুর লীলা যদি পাঠ করেন, ফুল্লজ্যোৎস্নালেখাবৎ মহাপ্রভুর স্বরূপ তাঁহার হৃদয়-পটে মুহূর্তমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহার জন্মজীবন সার্থক করিয়া দিবে।

অতঃপর বিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ ভক্তিপ্লুত ভাবধারায় রসিত জনগণকে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সূক্ষ্মতম তত্ত্ব লিখিয়া আমি এই অপার্থিব মহালীলার ব্যাখ্যা শেষ করিব।

প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা প্রেমবিলাসিনী মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধিকার প্রেমকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করার জন্যই কৃষ্ণস্বরূপ 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' তনু, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

পূর্ণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই অপ্রাকৃত, অলৌকিক লীলামাধুর্যে বিশ্ব জগতকে বিমোহিত, রসানন্দে উদ্বেলিত, আনন্দমুখর করিয়া তোলার জন্য আসিলেন কৈলাসপতি বিশ্বনাথ অদ্বৈত আচার্যরূপে। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসিলেন নামযজ্ঞের মহাসাধক ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুররূপে। বলরাম প্রভু নিত্যানন্দ হইলেন, দেবর্ষী নারদ হইলেন ভক্তপ্রধান শ্রীবাস। বিশাখা সখী হইলেন রায় রামানন্দ, শ্রীরাধিকা আসিলেন গদাধররূপে। এবং গোপরাজ নন্দ জগন্নাথ মিশ্র ও স্নেহময়ী যশোদা হইলেন পরমারাধ্যা শচীমাতা।

দেবলীলা অপার্থিব। মানুষের সীমায়িত জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা এ লীলার সামান্যতম উপলব্ধিও সম্ভব নয়। এ লীলা জানিতে হইলে, বুঝিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত গোপীনাথ আচার্যের উক্তি সদা স্মরণ রাখিতে হইবে—

'কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।'

উপসংহারে বলিব, স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্নের কর্ণধার শ্রীশান্তি সান্যাল মহাশয়ের সচেষ্ট সহৃদয়তায় 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' পুনর্মুদ্রণ সম্ভবপর হইল।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক ভারত সরকার ও সোভিয়েত সরকারের যুগ্ম পুরস্কারে পুরস্কৃত লেখকের লেখক দস্তয়েভস্কি রচয়িতা শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় মহোদয় 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থখানি মুদ্রণে এবং প্রকাশনে সহায়তা সর্বোপরি তাহার প্রজ্ঞাযুক্ত পরামর্শ, সযত্ন সহানুভূতি ও সক্রিয় প্রচেষ্টা গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিবে।

'জয় গৌরহরি'

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তচরণ-কৃপা ভিখারী

সরোজ মজুমদার

১

নীলাচল শ্রীগৌরাঙ্গের লীলানিকেতন। পুণ্যভূমি নীলাচল গৌরাঙ্গ-লীলার গৌরব-চিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া অতীতের মধুর স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। জগন্নাথ-ক্ষেত্র হিন্দুর মহাতীর্থ। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ও নীলাচলে তাঁহার একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ অধিষ্ঠান ও গৌরগত-প্রাণ ভক্ত-বৃন্দের নিত্য সমাগমে সে পুণ্যক্ষেত্র আরও উজ্জ্বলরূপে ধর্মকামী হিন্দুর মানস-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগীরথীর তীরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাঢ়দেশ দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে মুহ্যমান ভক্তমণ্ডলীর কিঞ্চিৎমাত্র শোক অপনোদনের জন্য নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে লইয়া আসেন।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-ভবনে পুনরাগমনের শুভ বার্তা লইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গমন করিলে, নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একবার তাঁহার দর্শনাভিলাষে শান্তিপুর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পুত্রশোকাতুরা শচীমাতাও তাঁহার নিমাইকে একবার দেখিবার জন্য অদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন। সন্ন্যাস

গ্রহণের পর মাতাপুত্রের এই প্রথম সাক্ষাৎ—সে মিলনের দৃশ্য বড় শোকাবহ।

"শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবত হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিয়া॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

মহাপ্রভু মাতৃভক্ত-শিরোমণি। জীবের কল্যাণ কামনায় যে মহান্ ভাবাবেশ তাঁহাকে সন্ন্যাসের পথে লইয়া গিয়াছিল, তাহার বিরাট গাম্ভীর্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাতৃভক্তি নতশীর্ষে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে তীব্র আবেগের বিশ্বপ্লাবী উচ্ছ্বাস বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া আত্ম-বলিদানে জগতে অচিন্ত্যপূর্ব প্রেম-প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সে ঐকান্তিক মাতৃভক্তি পুণ্যতোয়া নির্মল-সলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সর্বদা স্বচ্ছ, পরিপূর্ণ ও টলমলায়মান থাকিত। মহাপ্রভুর মাতৃভক্তির তুলনা নাই। তাহা জীবের আদর্শ—পরম শিক্ষার স্থল। অদ্বৈত-ভবনে তিনি শচীমাতাকে বলিলেন, "মা, আমি না বুঝিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে যে স্থানে থাকিতে বল, আমি সেই স্থানেই বাস করিব—আমি তোমার প্রতি কখনও উদাসী থাকিব না।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইহা যে কত বড় কথা—মাতার প্রতি এই নির্ভরতা কতদূর শক্তির পরিচায়ক, তাহা সহজেই বোধগম্য। মহাপ্রভু জননীকে জানিতেন, তাই জীবনের এই সমস্যা কালেও অবলীলাক্রমে জননীর প্রতি এমন করিয়া নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর এই কথায় সকল ভক্তই বিশেষ আশান্বিত হইলেন। শোকক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র শেষ অবলম্বন নিমাইকে যে শচীমাতা দূরে অবস্থান করিতে উপদেশ দিবেন না, তাহা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রভুর কথায় উৎফুল্ল-চিত্ত আচার্যাদি ভক্তবৃন্দ বড় আশা করিয়া শচীমাতা সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একটি কথার উপর যে মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি—ম্রিয়মান নবদ্বীপের চিরকালের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাহা শচীমাতার বুঝিবার বাকী রহিল

না। নিমাইকে দূর দেশে পাঠাইয়া দিলে তাঁহার নিজের কি দশা হইবে, এই কয়েক দিবসের অদর্শনেই তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলেন।

বিরহ-বিহ্বলা কনকপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ তাঁহার মনে উদিত না হইতেছিল তাহা নহে। কিন্তু শচীমাতা যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা মহাপ্রভুর জননী হইতেই সম্ভব, আর কোন মাতা পারিতেন না। তিনি বলিলেন,—

"তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যবে দুই কার্য্য হয়॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ সেই নিজ করি মানি।"

(চৈঃ চরিতামৃত)

এই অভাবনীয় স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টে ভক্তবৃন্দ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শচীমাতা নবদ্বীপের বা নিকটবর্তী কোন স্থানের উল্লেখমাত্র না করিয়া, সেই সুদূর নীলাচলে মহাপ্রভুর স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচন করিবেন - ইহা কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই। শচীমাতার এই মহাবাণী শ্রবণে ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন।"

ইহা কে লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবে? আর মহাপ্রভুকে রাখা যাইবে না। মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলেই বাস করিতে সংকল্প করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত এই স্থানে শচীমাতাকে জগন্মাতা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক, এমন মাতা না হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গর্ভে জন্ম লইবেন কেন?

মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া ভক্তগণের দৈন্যে ও কাতর অনুনয়ে মহাপ্রভু কয়েক দিবস অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করেন। কীর্তনানন্দে, অহরহ ভক্তগণের সমাগমে অদ্বৈত-ভবন সর্বদা মুখরিত থাকে।

"দিনে কৃষ্ণকথা রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্তন রঙ্গে॥

আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করেন প্রভু লঞা ভক্তগণ॥"

ক্রমে এ আনন্দের দিন অবসান হইয়া আসিল। প্রাণ-প্রতিম ভক্তগণের মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া জননীকে প্রবোধ দিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ মহাপ্রভু নীলাচল পথে "শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, পণ্ডিত দামোদর ও মুকুন্দ, এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন।

২

মহাপ্রভু যে পথে নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে। পদব্রজে সুদীর্ঘকাল নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া তখন নীলাচল যাওয়া বড়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য ছিল। মহাপ্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে সঙ্গীগণ সহ মহা কুতূহলে ছত্রভোগে আসিলেন। এইখানে গঙ্গা শতমুখী। প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করিলেন।

"স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে।
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥" (চৈঃ ভাগবত)

দৈবক্রমে তথায় গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডবত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর প্রেমানন্দে বাহ্যাপেক্ষা নাই।

"হা-হা জগন্নাথ প্রভু বোলে ঘন ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন॥"

(চৈঃ ভাগবত)

কিছু স্থির হইয়া প্রভু রামচন্দ্র খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" রামচন্দ্র নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।

"প্রভু বোলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমত সকাল॥

বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচল-চন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥"

পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া রামচন্দ্র খাঁ ছত্রভোগ হইতে মহাপ্রভুর নৌকাযোগে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

নৌকাযোগে মহাপ্রভু উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নৌকা প্রয়াগ-ঘাটে পৌঁছিল এবং প্রভু নিজগণ সহ তীরে উঠিলেন। তথা হইতে পদব্রজে অগ্রসর হইয়া স্বর্ণ রেখা তীরে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণ রেখায় স্নানাদি করিয়া ক্রমে জলেশ্বরে এবং তথা হইতে রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা বর্তমান বালেশ্বর স্টেশনের নিকট, মাত্র আড়াই ক্রোশ ব্যবধান। এখানে পরম মোহন গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই দেবস্থলীতে তাঁহার সেবা পূজা অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু গোপীনাথ সম্মুখে আনন্দে কীর্তনাদি করিয়া সঙ্গীয় ভক্তগণের নিকট মাধবেন্দ্র পুরীর বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিলেন। কৃষ্ণ-প্রেম-বিহ্বল ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম অদ্যাবধি "ক্ষীরচোরা" নামে অভিহিত।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥

বস্তুতঃই মাধবেন্দ্র পুরী ভাগ্যবান। মাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল মাধবেন্দ্রের নবজলধর দর্শনে কৃষ্ণস্ফূর্তি হইত। মাধবেন্দ্র গোবর্ধনের সন্নিকট কোন গ্রামে গোপালদেবের এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালের আদেশে নীলাচল হইতে চন্দন আহরণের জন্য রওনা হইয়া তিনি এক দিবস প্রদোষকালে রেমুনায় আসিয়া উপস্থিত হন। গোপীনাথের সেবার সৌষ্ঠব দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইলেন; কখন কি প্রকার ভোগ ঠাকুরকে দেওয়া হয়, সেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, সন্ধ্যাকালে "অমৃতকেলি" নামক দ্বাদশ মৃৎভাণ্ডে এক অপূর্ব আস্বাদ্য ক্ষীর ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে—

"পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর।"

মাধবেন্দ্র মনে ভাবিলেন, যদি এই ক্ষীর ভোগের যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া

আস্বাদ জানিতে পারিতেন, তবে সেইরূপ ভোগ গোপালকে দিতেন। প্রসাদ পাইবার লোভ মনে উদিত হওয়ায় বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অপরাধী জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন।

"অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥"

অযাচিত-বৃত্তি ভোগ-লালসা-বর্জিত সেই মহাপ্রেমিকের আহার সংগ্রহের কোন যত্ন ছিল না—কাহারও নিকট আহার্য যাচ্ঞাও করিতেন না।

যদি কেহ কৃপা করিয়া আহার্য কিছু দিত, গ্রহণ করিতেন, নতুবা উপবাস। অভুক্ত পুরী গোস্বামীকে ভগবান স্বয়ং এক দিবস গোপ-বালক বেশে আসিয়া দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন। গ্রামবার্তা ভয়ে তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্গী কেহ ছিল না। অহর্নিশি কৃষ্ণনামামৃতে সিঞ্চিত। প্রসাদ পাইবার সাধ মনে উদিত হওয়ায় নিজকে অপরাধী জ্ঞানে মন্দির হইতে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া গ্রামের শূন্য হাটে গিয়া কীর্তনে নিশি যাপন করিতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্রের মনের ভাব গোপীনাথের সেবকগণের কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট তাহা অবিদিত রহিল না। পূজারী সান্ধ্য ভোগাদি অন্তে ঠাকুর শয়ন করাইয়া নিদ্রিত। নিশীথ রাত্রিতে জনসমাগমের চিহ্ন নাই, এমন সময় পূজারী স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—

"উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লৈয়া॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

পূজারী ত্রস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ঠাকুরের ধড়ার অঞ্চলে প্রকৃতই ক্ষীরের এক মৃদ্ভাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাগ্যবান মাধবপুরীকে হাটে যাইয়া তাহা প্রদান করিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র সস্মিত আনন্দে সেই মহাপ্রসাদের অনাস্বাদিত স্বাদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। পুরী গোস্বামীর অন্যান্য প্রস্তাব বিবৃত করিয়া যে শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাঁহার নির্বাণ প্রাপ্তি হইয়াছিল—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

সেই শ্লোক বলিতে বলিতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বার বার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার ॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্য ॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

রেমুনা হইতে মহাপ্রভু যাজপুরে এবং তথা হইতে কটকে আসিলেন, কটকে তৎকালে সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন। সাক্ষীগোপাল অতি সুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর। এই বিগ্রহের নাম কেন সাক্ষীগোপাল হইল, কেমন করিয়া বৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোপালদেব একনিষ্ঠ এক ভাগবত ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রতিমা মূর্তিতে কটক আসিয়াছিলেন, তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রভু সঙ্গিগণসহ নিত্যানন্দের নিকট শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হন।

লোকাতীত লীলাশালী সাক্ষীগোপালের অশ্রুতপূর্ব মধুর কাহিনী শ্রবণ বিষয়সঙ্কুল ও অবিশ্বাসীর পক্ষে বস্তুতঃই মহৌষধির ফলস্বরূপ।

তাই সে অপরূপ মধুরিমায় অনবদ্য কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না।

একদা লীলাকীর্তনরত প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষী গোপালের মধুর কাহিনী শ্রবণে ভক্তিপ্লুত ভাবধারায় স্বীয় ভক্তগণ সঙ্গে একরাত্রি এই মনোহর গোপাল-সৌন্দর্য দর্শনে আনন্দে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সেই দেবতা যিনি—'পদ্ভ্যাং চলম্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্। দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং তৎ সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি।—তাই গোপাল বিভব ও বৈভব অপার অতুলনীয় সর্বযুগবরেণ্য।

একদিন বিদ্যানগরের সরলপ্রাণ অনাড়ম্বর দুইজন ব্রাহ্মণ তীর্থার্থে গমন করিলেন। হৃষ্টচিত্তে উভয়ে, গয়া, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি সশ্রদ্ধায় দর্শন করিয়া মথুরা আগমন করিলেন। গোবর্ধন দ্বাদশবন দর্শন করিয়া পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। উভয়েই প্রসন্ন, তীর্থ-দর্শনে প্রফুল্ল।

তারপর গোবিন্দস্থান, মহাদেবালয়ে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনবিলাস কেশিতীর্থে, কালিয় হ্রদাদিতে স্নান করিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। উপরন্তু গোপালের শ্রী সৌন্দর্য উভয়ের মনকে ব্যাকুল আনন্দ-আবেগে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া তাহারা সেই রম্যস্থানে দুই চারিদিন অবস্থানের জন্য মনস্থির করিলেন।

দুই বিপ্রের মধ্যে একজন বৃদ্ধপ্রায়, অপরজন যুবা। বড় বিপ্রকে ছোট বিপ্র সবদাই সেবাযত্ন করিতেন। ছোট বিপ্রের আন্তরিক সেবাযত্নে অল্পকাল মধ্যে বড বিপ্র তাহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। সহাস্যে বড বিপ্র তাহার প্রসংশায় মুখর হইয়া উঠিলেন। এমন কি নিজ পুত্রের দ্বারাও এমন সেবাযত্ন পাওয়া সম্ভব নয়।

আজ ছোট বিপ্রের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে বিনাশ্রমে স্বচ্ছন্দচিত্তে তীর্থদর্শন সম্ভবপর হইল। এবংবিধ বিচার অন্তে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, ছোট বিপ্রকে তিনি তাঁহার কন্যাদান করিবেন।

ছোট বিপ্রের এই অকুণ্ঠ সেবাযত্নে তুষ্ট হইয়াই বড বিপ্র বলিলেন,—

কৃতঘ্নতা হয় তোমাব না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥

ছোট বিপ্র এই অসম্ভব কথায় ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করিল। ছোট বিপ্র বলিল,—

মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদি বিহীন॥

তোমার মত সদ্‌কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের কন্যাদানের পাত্র আমি নই। বিনয়-বিনীত ছোট বিপ্র অতি বিনম্রে বড বিপ্রকে বলিল, আমি কৃষ্ণপ্রীতিতে নিরন্তর তোমাকে সেবা করিয়া থাকি। কারণ ব্রাহ্মণ সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতিলাভ হয়।

কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার।
ব্রাহ্মণ সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়॥

ছোট বিপ্রের কথায় বড বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, তোমার আচরণে আমি সত্যই তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সংশয় করিও না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তোমাকেই আমি আমার কন্যা অর্পণ করিব।

ছোট বিপ্র তবুও তাহাকে সতর্ক করিবার প্রয়াসেই বলিল, তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলেই বর্তমান, বহু জ্ঞাতি, গোষ্ঠী এবং অনেক বন্ধুবান্ধবও

আছেন। এমতাবস্থায় তাহাদের সম্মতি ব্যতীত কন্যাদানের অঙ্গীকার তোমার সঙ্গত হইবে না। হয়তো শেষে রুক্মিনীর পিতা ভীষ্মকের অবস্থায় পড়িতে হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বড় বিপ্র দৃঢ় চিত্তে বলিলেন, কন্যা আমার নিজের, নিজের ধন অপরকে দিতে কে নিষেধ করিবে। আমি অপর সকলকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকেই কন্যাদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।

ছোট বিপ্র ইহার পর বলিলেন, বেশ তুমি যদি সত্যই কন্যাদান করিতে চাও তাহা হইলে এই গোপালের সম্মুখে তাহার অঙ্গীকার কর।

বড় বিপ্র কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গোপালের সম্মুখেই তাহার সত্য কথা বলিলেন।

নির্বিকার বিগ্রহ গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবেগভরে ছোট বিপ্র গদগদ কণ্ঠে বলিল, ঠাকুর তুমি আমার সাক্ষী, যদি অন্যমত হয় তবে তোমাকেই সাক্ষী দিতে হইবে।

ইহার পর উভয়েই দেশে ফিরিয়া চলিলেন।

স্বগৃহে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর বড় বিপ্র মনে মনে অত্যধিক চিন্তিত হইলেন। তীর্থাবস্থায় অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় উতলা হইয়া উঠিলেন।

এতকাল সেই সযত্নরক্ষিত গুপ্ত কথা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হইতে সংগোপনে বহন করিয়াছেন। এখন তাহার একটি সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি একদা স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে একত্রে আহ্বান করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন।

বিপ্রের কথা শুনিবামাত্র তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল এবং বিপ্রকে,

'ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর,
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।

এই বলিয়া তাহাকে যুগপৎ সতর্ক ও শাস্ত্রনিষেধাজ্ঞা করিতেও তাহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। এমন কি চতুর্দিক হইতে উপহাস, তাচ্ছিল্যের রোলও উঠিল।

বিপ্র দৃঢ় চিত্তে বলিলেন,

তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হও সে হও আমি দিব কন্যাদান

ইহা শুনিবাত্র এক দুর্বিষহ পরিবেশের সৃষ্টি হইল।

জ্ঞাতি লোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥

বিপ্র তখন সাক্ষীর কথা উত্থাপন করিয়া জানাইলেন যে, সাক্ষী দ্বারা ছোট বিপ্র কন্যা জিনিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমার ধর্ম ব্যর্থ হইবে।

পুত্র তখন পিতাকে বলিলেন, এ সমস্তই অবিশ্বাস্য। বহুদূর দেশস্থিত প্রতিমার সাক্ষী কখনও সম্ভব না। এ সমস্ত চিন্তা নিরর্থক। তাহা অপেক্ষা যখন ছোট বিপ্র আসিবে, তাহাকে আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। এমত বলাই যুক্তিযুক্ত হইবে। যদি তুমি বল যে তুমি কিছুই জান না তবে ব্রাহ্মণকে পরাভূত করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না।

ইহা শুনিয়া ধর্মভীরু সরলমতি বড বিপ্র অতিশয় চিন্তিত হইয়া পডিলেন এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া পরিশেসে একাগ্র মনে একান্তভাবে গোপাল-চরণ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মোর ধর্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
তুই রক্ষা কর গোপাল লইলু শরণ॥

বড বিপ্রের কণ্ঠে ব্যাকুল মিনতি ঝরিয়া ঝরিয়া পডিতে লাগিল।

কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদা লঘু বিপ্র ধীবে ধীরে বড বিপ্রের নিকট আসিয়া বিনম্র চিত্তে তাহাকে সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিয়া করজোডে পূর্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিল। এবং অঙ্গীকারবদ্ধ বড বিপ্রের প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এ কার্যে এতদিন যাবৎ অগ্রসর না হইবাব দরুণ কিঞ্চিৎ অভিযোগও তাহার কণ্ঠে স্ফুরিত হইল।

বড় বিপ্র কোনরূপ উত্তর না দিয়া মৌন হইয়া রহিলেন।

এমন সুযোগের অপব্যবহার নিরবুদ্ধিতারই নামান্তর জ্ঞানে তাহার পুত্র 'হাতে ঠেঙ্গা করি মারিতে আইসে।'

ছোট বিপ্র তখন অতিশয় মর্মাহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

অপর একদিন ছোট বিপ্র গ্রামের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া বড বিপ্রকে সেখানে ডাকিয়া আনিল।

ছোট বিপ্রের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যে গ্রামস্থ লোকেরা বড় বিপ্রেরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

বড় বিপ্র অনায়াসে বলিলেন,—

শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি না হয় স্মরণ॥

পিতার কথা শুনিবামাত্র তাহার পুত্র বাক্‌চাতুরীজালে গ্রামের সকলকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

সে বলিতে লাগিল, তীর্থ যাত্রায় পিতার সঙ্গে বহু ধনসামগ্রী থাকিবার দরুণ এই দুষ্ট বিপ্র দুরভিসন্ধি লইয়া বৃদ্ধ পিতাকে নিশ্চয়ই একাকী পাইয়া ধুতুরা ইত্যাদি ভক্ষণ করাইয়া অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছে। তাহা না হইলে পিতার এমত মতিভ্রম কদাপি সম্ভব নয়। সভাসদেরা নিজেরাই বিচার করিয়া স্থির করুণ, আমার পিতার কন্যা কী ইহার যোগ্য?

বিপ্রপুত্রের এরূপ বিভ্রান্তিকর বাক্‌ছলে গ্রামের লোকদের মনেও সংশয় দেখা দিল।

বস্তুতঃই "ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্মভয়।"

ছোট বিপ্র তখন স্বীয় সত্য ভাষণ অবলীলাক্রমে সকলের সম্মুখে প্রকট করিল। এবং বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও যে বড় বিপ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন তাহাও বলিল। কিন্তু কোনক্রমেই যখন সে বড় বিপ্রকে তাহার স্থির কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারিল না তখন বিগ্রহ গোপালকে সাক্ষী স্থাপন করিয়া সে বড় বিপ্রের উক্ত ভাষণ স্থিরিকৃত করিয়াছে।

ছোট বিপ্র বলিল,—

এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
তার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥

বড় বিপ্র এতক্ষণ পরে বলিলেন, যদি গোপাল নিজে আসিয়া সাক্ষী দেন তবে নিশ্চয়ই আমি আমার কন্যাদান করিব।

একমাত্র ধর্মরক্ষা হেতু বড় বিপ্র এই কথা বলিলেন। কারণ তিনি জানেন কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর। নিশ্চয়ই তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

উপস্থিত সকলেই এই বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। ছোট বিপ্র সকলের কথায় সম্মত হইলে গ্রামের সমস্ত লোক উভয়ের সম্মতি লইয়া এক পত্র লিখিল।

ছোট বিপ্র সভাজনদের বলিল, বড় বিপ্র সত্যই সত্যবাদী ও ধর্মপরায়ণ।

স্বীয়বাক্য ত্যাগ করিতে ইনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। একমাত্র স্বজনমৃত্যুভয়েই তিনি অসত্য বলিলেন। ইহার পুণ্যেই কৃষ্ণকে আনিয়া আমি সাক্ষী দেওয়াইব। তাহা হইলেই বিপ্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইবে।

ছোট বিপ্রের কথা শুনিয়া কেহ উপহাস, কেহ পরিহাস আবার কাহারও মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।

শুচিশুদ্ধচিত্তে ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে চলিল। বিগ্রহ গোপালের সম্মুখে উপনীত হইয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ভক্তিপ্লুত অন্তরে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিল—

ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেহ তার পাপ হয়॥

ভক্তের আহ্বান ভগবানের উপেক্ষা করা কখনও সম্ভব নয়। একাধারে সরল-প্রাণ ভক্তের অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ভক্তি-অর্ঘ্য, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার মহিমা স্থাপন, সর্বোপরি স্বীয় অপ্রকৃত লীলা প্রদর্শনার্থে ভগবান তুষ্ট হইয়া বিপ্রকে বলিলেন,—

বিপ্র তুমি যাহ ভবনে।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে॥
আবির্ভাব হইয়া আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব॥

ইহা শুনিয়া— বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো না হবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি স্বকার্য সাধন॥

গোপাল মৃদু হাসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তোমার পিছনে পিছনে আমি যাইব। তুমি কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া দর্শন করিও না। যদি অন্যথা কর তবে দর্শন মাত্রেই আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব। শুধুমাত্র নূপুরের ধ্বনি শুনিবে। আর সেই শব্দে বিশ্বাস করিয়া তুমি অগ্রসর হইবে। প্রতিদিন এক সের অন্ন রন্ধন অন্তে আমায় সমর্পণ করিবে।

ভগবানের নির্দেশে বিপ্র যুল্লানন্দে দেশাভিমুখে গমন করিলেন। পিছনে নূপুরের ধ্বনি। বিপ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেছে।

এইভাবে বিপ্র নিজদেশে আগমন করিল। গ্রামের নিকটে আসিয়া বিপ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—

তবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষী আগমন॥
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়।
ইহাঁ যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয়॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরি। চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাঁহাই রহিল॥

বিপ্র তখন হৃষ্টচিত্তে দ্রুতপদে নগরে গিয়া সকলকে বলিল। সর্বলোক চমৎকৃত হইয়া হর্ষ-উদ্দীপ্ত চিত্তে পরব্রহ্মকে দেখিবার নিমিত্ত দ্রুত গমন করিল।

মনোহর গোপালের ভুবনমোহন রূপ দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল জনতা বিস্ময় আনন্দে আত্মহারা।

'প্রতিমা চলি আইলা দেখি হইলা বিস্মিত'।

অপার বিস্ময়ে সীমাহীন আনন্দে বড় বিপ্র হতবাক।

বিগ্রহ গোপালের সুমধুর কণ্ঠস্বরে উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে রুদ্ধবাক। গোপালদেব ভক্ত ব্রাহ্মণের ধর্মভক্তি জনগণ সমক্ষে প্রকট করিলেন। তারপর গোপাল দুই বিপ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—

তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর।
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁহে মাগ বর।

ইহা শুনিয়া উভয় বিপ্র ভক্তবৎসল গোপালকে বলিল,—

যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্বলোক জানে॥

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের ইচ্ছায় সেইস্থানেই অবস্থান করিলেন। দেশের বহুশত অগণ্য মানব আসিয়া শ্রীভগবান দর্শনে জন্ম জীবন সার্থক করিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া যথাস্থানে আসিয়া গোপালদর্শনে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। রাজা গোপালের জন্য শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়া দৈনন্দিন সেবাকার্যে রত হইলেন।

এই গোপালই সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত। তারপর বহুকাল পরে একদা আর্যভক্ত রাজা পুরুষোত্তম দেবের ভক্তিরসসিক্ত আকুল মিনতিতে গোপাল স্ব ইচ্ছায় কটকে আগমন করিয়া অদ্যাবধি সেখানেই অবস্থান করিতেছেন।

প্রভু কটক হইতে ভুবনেশ্বর এবং তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কমলপুর পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই—

"জগন্নাথ-মন্দির প্রভু দেখিল আচম্বিতে।"
"চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবন চালিত তাথে পতাকা রাতুল॥
নীলগিরি মাঝে হরি-মন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

প্রভু দেখিতে পাইলেন—

"অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সহসা উঠিয়া বিহ্বলচিত্তে প্রভু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গিগণকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেউল-উপরে কিছু দেখহ নয়নে।"
"নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

তাঁহারা পুনর্বার প্রভুর মূর্চ্ছা হইবার আশঙ্কায় কিছু দৃষ্টিপথে না পড়িলেও বলিলেন, "হাঁ, দেখিতেছি।" প্রভু পুনর্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দেউল-ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর।"
'প্রসন্ন বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ।
আলোল অঙ্গুলি করতল অপরূপ॥
আমারে ডাকয়ে কর কমল-লাবণ্য।
বাম করে বেণু শোভে ত্রিজগৎ ধন্য॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—সে কি বিচিত্র দৃশ্য !

"জগন্নাথ-মন্দির দেখি গোরারায়।
পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলি যায়॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে॥
পুনরপি জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া।
পুনঃ পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
অঝোর ঝরয়ে দুই নয়নের নীর।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতী গভীর॥"

(চৈঃ মঙ্গল)

জগন্নাথ-প্রাসাদের দিকে ব্যাকুলিত-স্থির-নিবদ্ধ-দৃষ্টি মহাপ্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রেমে টলিতে টলিতে চলিয়াছেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসসি পুরঃ স্মের বক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত সুবদনো বাল-গোপাল-মূর্ত্তিঃ॥"

যাঁহার মুখপদ্ম বিকশিত, সেই বালগোপাল মূর্তি সুমধুর হাস্যে শ্রীবদনের শোভা বিস্তার করিয়া প্রাসাদোপরি আমার পুরোভাগে অবস্থিত আছেন।

নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-দণ্ড ছিল। নিত্যানন্দ ভাবাবেশে ভার্গী নদী তীরে সেই দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করায় মহাপ্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু দণ্ডভঙ্গজনিত অপরাধে সঙ্গিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী ঊর্দ্ধশ্বাসে জগন্নাথ-মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

"হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দিকে ছোটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
(চৈঃ ভাগবত, অন্ত)

৩

প্রেম-বিহ্বল-তনু মহাপ্রভু যখন জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া মন্দিরতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের দ্বার-পণ্ডিত প্রথিতযশা পণ্ডিত-প্রবর বাসুদেব সার্বভৌম মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব ভট্টাচার্য নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত সেকালে কেহ ছিলেন না। তাঁহার আদি নিবাস নবদ্বীপ হইলেও, তিনি নীলাচলেই স্থায়ী বাসভূমি করিয়া শত শত শিষ্যকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতাপ ও সম্মানে তেমন লোক উৎকল রাজ্যে সে সময় অতি অল্পই ছিলেন। প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দ্রুত ধাবিত হইতেছিলেন, জগন্নাথ-সেবকগণ এই আকস্মিক ব্যাপারে সন্ত্রস্ত ও তাঁহার গরিরোধে অসমর্থ হইয়া মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সার্বভৌম ঠাকুর তখন নিজ শরীর আচ্ছাদনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত নিবারণ করিয়া সেবকগণকে দুরপনেয় কলঙ্ক ও অপরাধ হইতে রক্ষা করেন। সার্বভৌম প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য, প্রেম-বিকার দর্শনে মনে মনে বিচার করিলেন—

"এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।"
"সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে যে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়॥

অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

সার্বভৌম মূর্চ্ছিত মহাপ্রভুকে আপন ভবনে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন—

"সার্বভৌম বলে ভাই পড়িহারীগণ।
সভে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন॥
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥"

সার্বভৌম সযতনে প্রভুকে নিজ গৃহে এক অতি পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। ইতোমধ্যে নিত্যানন্দাদি মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া এক প্রেমিক সন্ন্যাসীর সংজ্ঞাহীন হওয়ার বিবরণ জানিয়া অবিলম্বে সার্বভৌম-গৃহ প্রতি ধাবিত হইলেন। দৈবাৎ তাহাদের পূর্বপরিচিত নবদ্বীপবাসী সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উচ্চ করিয়া নাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা হইল।

"হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্বভৌম নেন প্রভু-পদধূলি॥"

সার্বভৌম ভগিনীপতি গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্বাশ্রম ও পরিচয় জানিতে পারিলেন। পূর্বাশ্রম জানিবার পূর্বে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতি সার্বভৌমের যে এক প্রকার অব্যক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছিল, নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও স্বীয় পিতৃদেবের সতীর্থ নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র জানিয়া তাহার কিছু খর্ব হইল। ইহা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। অজানিত বস্তুর বৈচিত্র্য মানব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই তেজঃপুঞ্জ যুবক সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে তাঁহাকে নিজ হইতে উচ্চ স্তরের জ্ঞান করিয়া সার্বভৌম-হৃদয়ে যে আন্তরিক ভক্তির বিকাশ হইতেছিল, গোপীনাথের নিকট সন্ন্যাসীর নবদ্বীপের সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাহার সাহজিক স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া সেখানে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি হইল। তরুণ-বয়স্কের প্রতি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধের যে এক প্রকার স্নেহ-কোমল ভাব পরিলক্ষিত হয়, মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনজনিত সার্বভৌম

ঠাকুরের আন্তরিক শ্রদ্ধা বা ভক্তি তদ্রূপ এক নূতন বৃত্তিতে পরিণত হইল। বাসুদেব সার্বভৌম পরম পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যাভিমান এ যাবৎ তাঁহাকে অহর্নিশি এক কঠোর আবরণে আবদ্ধ রাখিয়া বহির্জগৎ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সমকক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সেকালে কেহ না থাকায় সার্বভৌমের আত্মম্ভরিতা কখনও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। পরবর্তী কালে তাহা প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে নিরুদ্বেগে বর্ধিত-কলেবর হইয়া লোকসমাজে নিজ একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সার্বভৌমের প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু মহাপ্রভু প্রথমতঃ তাঁহার সে প্রাধান্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন। সার্বভৌম ঠাকুরের মানসিক ভাব-বৈলক্ষণ্য মহাপ্রভুর অবিদিত ছিল না। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—

"তুমি জগৎ-গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

ইহাতে সার্বভৌমের অভিমান আরও স্ফীত হইল। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজনের প্রতি সচরাচর যে প্রকার উপদেশ স্বাভাবিক হইয়া থাকে, তিনিও মহাপ্রভুকে সেরূপ উপদেশাদি দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই সার্বভৌম মহাপ্রভুকে এত কোমল বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বিস্তর অনুযোগ দিলেন—

"পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥"

সন্ন্যাস লইলে যে 'অহঙ্কার-পাশে' বদ্ধ হইতে হয়, বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় সংসারাশ্রমীর নিকটও নমস্কার গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম—যাহা সর্বজীবে ভগবৎ অধিষ্ঠান জ্ঞানে আচণ্ডালে সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়, বিদ্যা-বিমোহিত-চিত্ত সার্বভৌম তাহা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞ লোক যে সন্ন্যাস

গ্রহণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য সার্বভৌম গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি মহাজনগণ পূর্বে সন্ন্যাস লইয়াছেন সত্য, কিন্তু—

"সে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন প্রবেশমাত্র সকলে তোমায়।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥
—কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ॥"

(চৈঃ ভাগবত)

প্রভুও রসিক-শেখর। সাবভৌমের এই মোহ অল্পে ভাঙ্গিতে দিলেন না। সাধারণ সরল মানুষের ন্যায় এই উপদেশাবলী শুনিয়া গেলেন, এবং বালকের মত বলিলেন—

"—শুন, সার্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়।
* * * *
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥
সব উপদেশ মোর কহ অমায়ায়।
তোমারি যে আমি ইহা জান সর্বথায়॥"

(চৈঃ ভাগবত)

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে একা জগন্নাথ দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং জগন্নাথ-মন্দিরে গরুড়ের সন্নিধানে থাকিয়া শ্রীমূর্তি দর্শন বিধেয় বলিয়া উপদেশ দিলেন।

তিনি যখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই প্রকার মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিবস ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—

"প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥"

উত্তরে গোপীনাথ বলিলেন—ইহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং 'গুরু ইহার কেশব ভারতী মহাধন্য।"

ভারতী সম্প্রদায় সন্ন্যাসীগণ মধ্যে সর্ব নিম্ন। গিরি, পুরী, সরস্বতী প্রভৃতি উচ্চ কোন সম্প্রদায় হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করাতে সার্বভৌম কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে গোপীনাথকে বলিলেন—

"—ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তিনি মহাপ্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। ভট্টাচার্যের এই গুরু-গম্ভীর উক্তি তিনি বড় ধৃষ্টতাব্যঞ্জক মনে করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—

"ভট্টাচার্য তুমি ইঁহাব না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥"

গোপীনাথের এই স্পষ্টবাদিতায় সার্বভৌমের সমবেত শিষ্যগণ কলরব করিয়া উঠিলেন—উঠিবারই তো কথা, তাঁহারা যাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, যদি কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন, তাহা নির্বিবাদে গ্রহণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যিনি এই ঈশ্বরত্ব আবোপ করিতেছেন, তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শিষ্যগণের পূজনীয় অধ্যাপকের ভগিনীপতি। শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন প্রমাণের বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলা যাইতে পারে? আচার্য বলিলেন, লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; অনুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান হয় না। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে অনুমান প্রমাণ নহে।

"কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।"

পরে সার্বভৌমকে তিনি বলিলেন, যদিও তুমি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, শাস্ত্রে তোমার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরের কৃপালেশও তোমাতে নাই; কাজেই এ তত্ত্ব তুমি জানিতে পারিতেছ না। তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের দেবশরীরে মহা প্রেমাবেশ দেখিয়াছ; তবু ঐশ্বরিক মায়ায় তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছ। সার্বভৌম ও গোপীনাথে অনেককালে ঈশ্বরাবতার শাস্ত্রানুমোদিত



কিনা ইহা লইয়া নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইল। গোপীনাথ শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিলেন। পরিশেষে সার্বভৌমের নিকট হইতে এই বলিয়া বিদায় লইলেন—

"তোমার আগে এই কথার নাহি প্রয়োজন।
উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিই কহিবে ॥

ভট্টাচার্যও তাঁহাকে শ্লেষপূর্ণ কথা বলিয়া তাহার অন্তঃকবণে আঘাত করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সার্বভৌমেব মন্তব্যে ক্ষুব্ধমনা গোপীনাথ ও মুকুন্দ মহাপ্রভুর সকাশে এই সব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, আমার প্রতি ভট্টাচার্যের অনুগ্রহ আছে। তিনি বাৎসল্যে আমাকে করুণা করিয়া থাকেন, ইহাতে দোষ কি?

কিছু দিবস পর একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌম সঙ্গে আনন্দে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে* আসিলেন এবং প্রভুকে আসন দিয়া বলিলেন, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীব ধর্ম। তুমি আমার নিকট বেদান্ত শ্রবণ কর। প্রভুও অতি ধীর ভাবে সরল শিশুর মত উত্তরে বলিলেন—

"সেই ত কর্তব্য আমার তুমি যেই কহ।"

সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন, আর মহাপ্রভু তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে পবিত্র শুভ মুহূর্তে জগন্নাথ-মন্দিরে এই বেদান্ত পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হিন্দুর ধর্ম-জগতের এক চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনই বেদান্তের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া তাহার প্রকৃত মর্ম প্রচার হইবার সূত্রপাত হইল—সূত্র ও ভাষ্যের দ্বন্দ্ব নিরাকৃত হইয়া বেদান্তের স্বরূপ প্রতিপাদ্য জীব-জগতে প্রচারিত হইল।

সপ্ত দিবস পর্যন্ত সার্বভৌম অতি সযতনে বেদান্ত পাঠ করিতেছেন, আর মহাপ্রভু নির্বাক হইয়া অবিচলিত ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেছেন।

এই সাত দিনের মধ্যে তিনি একটি কথাও বলেন নাই, কিম্বা বাহ্যিক কোন ভাবও প্রকাশ করেন নাই। অষ্টম দিবসের প্রারম্ভে সার্বভৌম তাঁহাকে বলিলেন—

* "মন্দির" শব্দে সার্বভৌম-গৃহও বুঝাইতে পারে।

"সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।"
"ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥"

প্রভু বিনীত ভাবে বলিলেন—আমি মূর্খ, আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শুনিতেছি; তুমি যে অর্থ কর, তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারি না।

সার্বভৌম কিছু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, যে বুঝিতে না পারে, সে তো জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি মৌন হইয়া থাক, তোমার হৃদয়ে কি আছে না আছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

এইবার মহাপ্রভুর মুখে কথা ফুটিল। নীরবতা সরবতায় রূপান্তরিত হইল।

বিস্মিত সার্বভৌমকে বিচলিত করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বেদান্তের গূঢ় অর্থের যে পূত মন্দাকিনী-ধারা সেদিন জগন্নাথ-মন্দির প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল, তাহার সম্মুখে সার্বভৌম ঠাকুরের জ্ঞানগর্ব, পাণ্ডিত্যাভিমান সমস্তই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—

"—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

শ্রীমন্দির কম্পান্বিত করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে প্রভু বলিতে লাগিলেন—

"ষড়ৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ॥

ষড়ৈশ্বর্য—পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥
মায়াধীশ মায়াবশ জীবে ঈশ্বরে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥" (চৈঃ চরিতামৃত)

মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে মায়াবাদ, পরিণামবাদ, ব্যাসসূত্রের সহ তাহার সম্বন্ধ, বিবর্তবাদ, প্রণব, জগৎ-উৎপত্তি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে একজন প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিয়াছেন, তিনি যে পণ্ডিতশিরোমণি—তাঁহার অপ্রমেয় অগাধ পাণ্ডিত্যের যে তুলনাই ছিল না, তাহা সার্বভৌম জানিতেন না। কাজেই এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভট্টাচার্য এই আলোচনা কালে পূর্বপক্ষ অনেক করিলেন, তর্ক, বিতণ্ডা অনেক উঠাইলেন, নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু—

"সব খণ্ডি প্রভু নিজমত যে স্থাপল।"

মহাপ্রভুর এই পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে সার্বভৌমের বিদ্যা-গৌরব একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

"শুনি ভট্টাচার্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ॥"

কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্বভৌমের মোহ কাটে নাই। তিনি এই অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও হৃতগর্ব হইলেন বটে, কিন্তু মহাপ্রভুকে মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বরত্বে আরূঢ় করিতে এখনও সন্দিহান। তিনি এক গভীর সংশয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, এই প্রতিভা, এই জ্ঞান, এই প্রেম, এই তেজ যে অমানুষী, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন, কিন্তু যে স্বভাবজাত সরল বিশ্বাসের আতিশয্যে সাধারণ মানব মহাপ্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, তেমন বিশ্বাসের অভাব থাকায় সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

এই সন্দেহসঙ্কুল অবস্থা হইতে মহাপ্রভু তাঁহাকে অচিরেই উদ্ধার করিলেন। সার্বভৌমকে কৃপাপুরবশ হইয়া বলিলেন, 'ভট্টাচার্য, বিস্মিত হইও না। ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের গুণাবলী এমনি অচিন্তনীয় যে, সমস্ত বন্ধনমুক্ত

আত্মরাম মুনিগণ পর্যন্ত ভগবানে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন', এই বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থভূত গুণো হরিঃ॥" (১১শ অধ্যায়)

এই শ্লোক শুনিয়া সার্বভৌম অতি বিনীত ভাবে বলিলেন—'মহাশয়, এই শ্লোকের অর্থ আপনার নিকট শুনিতে বাসনা হইতেছে।' সার্বভৌমের আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাদাতা গুরুর উচ্চ আসন হইতে তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষার্থীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সম্মুখে আর নিজের সে পাণ্ডিত্যাভিমান নাই—যে স্নেহ-করুণা-পরায়ণ চিত্তবৃত্তির আধিক্যে তিনি এক দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার এবং পুনরায় যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া সংস্কার করিয়া লইবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ কারয়াছিলেন, তাহা এখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমন মহাপণ্ডিত—মহাপ্রেমিকের প্রতি নিজ আত্মম্ভরিতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন।

প্রভু বলিলেন, তুমি প্রথমতঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর, পরে আমি যাহা কিছু জানি ব্যাখ্যা করিব। সার্বভৌম তর্কশাস্ত্রমত জ্ঞানচর্চায় শ্লোকটির যতদূর বিশ্লেষণ সম্ভব তদ্রূপ ব্যাখ্যা কবিলেন। তিনি নবম প্রকারে এই শ্লোকের অর্থ করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'ভট্টাচার্য, তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, তোমার ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। কিন্তু তুমি পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছ। ইহা ছাড়াও শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে।' ভট্টাচার্য প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌমকৃত নববিধ ব্যাখ্যা স্পর্শও করিলেন না। আত্মারামাদি শ্লোকের একাদশ পদে পৃথক্ পৃথক্ পদের অর্থ নিশ্চয় করিয়া অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যা চৈতন্যচরিতামৃতের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। সে যে কি গভীর তত্ত্বের স্ফুরণ, তাহা আমার মত অনধিকারীর ক্ষীণা লেখনীতে কি ব্যক্ত হইবে?

ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্বভৌম ঠাকুরের সমস্ত সন্দেহের আবরণ মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন হইয়া দিব্যালোকে তাঁহার নয়ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হইল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥

ইঁহো তো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈলুঁ গর্ব্বিত হইয়া ॥"

আত্মনিন্দা করিয়া সার্বভৌম প্রভুর শরণ লইলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বকীয় রূপ দেখাইলেন।

"দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥"

মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সার্বভৌম প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

"অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ভয়ে থরথরি।
নাচে, গায়, কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ॥"

জ্ঞান প্রেমে, নীরসতা কোমলতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ভগবৎ প্রেমিকের একান্ত নির্ভরপরায়ণতায় পরিণত হইল। বস্তুতঃ সার্বভৌমের পরিবর্তন এত আকস্মিক যে, সহসা ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে। জ্ঞানচর্চায় তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র প্রেমবন্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আকস্মিক হইলেও তাঁহার জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক। সার্বভৌম মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব-চূড়ামণিগণের মধ্যে গণ্য হইলেন। প্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই বেদবিহিত নিত্য ক্রিয়াকলাপজনিত বৈধী ভক্তির রাজ্য হইতে রাগভক্তির রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিলেন।

সাধনভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্র গায় ॥"

মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাদান কালে বৈধীভক্তির লক্ষণাবলী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা, পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥"

—প্রভৃতি বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণনা করিয়া তাহার পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিবৃত করেন।

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

রাগভক্তি ও বৈধীভক্তি মধ্যে অনেক প্রভেদ। রাগভক্তির অধিকারী কেবল ব্রজবাসিজন। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া ভগবানকে নিজ জন স্বরূপে যে ভজন, তাহাই 'রাগ ভজন।'

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।" ব্রজবাসীর ভগবানের প্রতি যে টান, তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া যদি কোন ভাগ্যবান লুব্ধান্তঃকরণে তাঁহাদের কোন ভাব আশ্রয় করিয়া ভগবৎ ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা রাগ ভজন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাগভজনে ভগবানের সহিত দাস, সখা প্রভৃতি কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

"দাস, সখা, পিত্রাদি প্রেয়সিগণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
বাহ্য, অন্তর, ইহার দুই তো সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

এই রাগভাজন ও তজ্জনিত ভক্তি যে কত বড় উচ্চ অধিকারীর কথা, তাহা সহজেই অনুমেয়। জন্মজন্মান্তর বিধিমার্গের ভজন দ্বারাও রাগ-ভজনের অধিকারী হওয়া যায় না। ইহার প্রধান লক্ষণ ভগবানকে পাইবার লালসা। তাঁহার প্রতি টান না জন্মিলে রাগভক্তি লাভ করা সুদুর্লভ।

রায় রামানন্দ নিজকৃত শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ।
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে॥
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং।
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"*

* কৃষ্ণভক্তি রস দ্বারা শোধিতা বুদ্ধি উপার্জন করা কতব্য। লালসাই তাহার একমাত্র মূল্য। তদ্ব্যতীত কোটিজন্মার্জিত পুণ্য দ্বারাও তাদৃশ মতি লাভের উপায় নাই।

এই "লৌল্যং" বা লালসাই রাগভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। শাক্ত ভক্তের মাতৃভাবে সাধনাও রাগভজনের অন্যতম প্রকার বিশেষ। সাধক নিজকে সন্তান জ্ঞানে ভগবানকে যে মাতৃভাবে ভজনা করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যেও সেই "লৌল্যং"ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনীতে এইরূপ ভজনই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

রাগভক্তির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, রাগভক্ত শাস্ত্রযুক্তি মানিয়া চলেন না। তাঁহার কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধির পরে। সার্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, শাস্ত্রানুমোদিত বৈধী ক্রিয়াকলাপে তিনি আজন্ম অভ্যস্ত। তাহা লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অতীব দোষাবহ। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপালাভে তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে। তিনি রাগভজনের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,—আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এক দিবস মহাপ্রভু অরুণোদয় কালে মহাপ্রসাদ লইয়া সার্বভৌমগৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সার্বভৌম "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া জাগরিত হইলেন। সার্বভৌম প্রভুকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন এবং সার্বভৌম প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করিয়া, দ্বিধাবিহীন চিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

"প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিলা ভক্ষণ॥
সন্ধ্যা, স্নান, দণ্ডধারণ যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য প্রসাদে মনের জাড্য সব গেল॥"

ভট্টাচার্য কর পাতিয়া ভক্তিসহকারে মহপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই শ্লোক পড়িয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন,—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণাঃ॥

পণ্ডিতপ্রবর সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে এই ঐকান্তিক বিশ্বাস দেখিয়া মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইলেন। সার্বভৌম এখন মহাপ্রভুকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচী-সুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥" (চৈঃ চরিতামৃত)

এক দিবস সার্বভৌম এক তালপত্রে দুইটি শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত জগদানন্দের হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা পাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুকুন্দ শ্লোক দুইটি ভিত্তিগাত্রে পূর্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ভক্তবৃন্দ তাহা দেখিয়া শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন। শ্লোক দুইটি ভক্ত-কণ্ঠমণিহার। ইহা হইতেই সার্বভৌমের গৌরভক্তি দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে,—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

৪

প্রভু মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ফাল্গুন মাসে (১৫১০ খৃঃ অব্দে) নীলাচল আগমন করেন এবং চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর প্রসাদে সার্বভৌমেব যে পরিবর্তন আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে "উদ্ধার" ব্যতীত অপর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। মহাপ্রভুর কৃপা-সম্পদ লাভ করিয়া নিজে তিনি দৈন্যপ্রকাশে এক দিবস বলিয়াছিলেন,—

"তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

মহাপ্রভুর কৃপালাভে সার্বভৌমের এই আমূল পরিবর্তনের মঙ্গলবার্তা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল এবং লোকের মনে শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে কিছু দ্বিধা ছিল, তাহা বিদূরিত হইল। হইবারই তো কথা! চৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

"লোহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।"

মহাপ্রভুর অবতারবাদ লইয়া আজ সার্ধ চারিশত বর্ষ পর যে সমস্ত সন্দেহ-সঙ্কুল তর্কের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই অজ্ঞতাপ্রসূত। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আদ্যন্ত ধীরভাবে আলোচনা করিলে, তাঁহার ভাগবত্তা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ উদিত হইতে পারে না। কোন কোন সুধী গৌরভক্ত মহাপ্রভুর বিস্তৃত জীবনীতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু গৌরলীলা সমাহিতচিত্তে ধারণা করিলে ইহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে যে, মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এ ধারণা তাঁহার লীলা আলোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল।

সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাপ্রভুকে প্রথমতঃ সাধারণ মানব জ্ঞানে তাঁহার প্রতি যে ভাব পোষণ করিতেছিলেন, তাহা স্বল্পকাল মধ্যে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উন্মূলিত করিয়া তাহাকে অবনত মস্তকে 'পুরুষ পুরাণ' বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন, তাঁহাকে একমাত্র উপাস্য জ্ঞানে তাঁহার দৈনন্দিন সেবা, পূজা জীবনের প্রধান সম্বল করিলেন। মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রমাণের ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মহাপ্রভু চৈত্রমাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া নববর্ষের প্রথমার্ধে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ইচ্ছা ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম বলিলেন,—

"শিরে বজ্র পড়ে, যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥"

মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের কিরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, উপরি উক্ত শ্লোক তাহার আভাস প্রদান করিতেছে।

কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নাম-প্রেম বিতরণে বহির্মুখ জীবকে উদ্ধার করিতে প্রভু কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, কাজেই ভক্তগণের কোন অনুরোধ রক্ষিত হইল না। একমাত্র সেবক সঙ্গে প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

"মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সঙ্কীর্তন॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥

সুধা বর্ষণ করিতে করিতে প্রভু অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও জীবকে বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত করিবার বিবরণ বর্তমান আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই ভ্রমণ কালেই প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তটে রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর শুভ সাক্ষাৎ এবং বৈষ্ণব ধর্মের ভজন রহস্য আলোচিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ-লীলায় রামানন্দ-মিলন এক অপূর্ব আখ্যান। গৌরভক্তের সম্মুখে রামানন্দের অপ্রাকৃত প্রেম-ঘন আখ্যায়িকা আলোচিত না হইলে গৌরলীলা অসম্পূর্ণ থাকে যদিও তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি ও ভাগ্য বর্তমান লেখকের নাই।

রায় রামানন্দ বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে বৈষ্ণবধর্ম প্রোজ্জ্বল। চিরজ্যোতিস্মান। রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুহৃদ, সখা, মধ্য ও অন্তলীলার নিত্য সহচর। তিনি মহাপ্রভুর অন্যতম মরমী ভক্ত। তাঁহার শুচিশুদ্ধ পূত জীবনী আলোচনায় বিষয়-পঙ্কিল মানব-মন ক্ষণিকের জন্যও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া অনাস্বাদিত ভাবারাজ্যের নিগূঢ় মহিমা জানিবার জন্য উন্মুখ হয়।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র উৎকলের দুর্দান্ত প্রতাপশালী হিন্দু নরপতি। তিনি স্বীয় ভুজবলে মুসলমান রাজা হইতে সমগ্র উৎকল ভূমি উদ্ধার করিয়া হিন্দুধর্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। তীক্ষ্ণধী কায়স্থ বংশোদ্ভব রায় রামানন্দ স্থিতধী মহারাজার অন্যতম পার্ষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি বলে তিনি সাম্রাজ্যের অতি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর প্রদেশের শাসনকর্তা পদে উন্নীত হইয়া তিনি মানে, সম্ভ্রমে, প্রতাপে, পদমর্যাদায় রাজ্যের জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র জটিল রাজ্যসংক্রান্ত সমস্যায় তাঁহার সুচিন্তিত উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজকার্য চালাইতেন।

রামানন্দ নৈয়ায়িক শিরোমণি পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্বভৌমের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নীলাচলে উভয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু রায় রামানন্দের বাহ্যিক ব্যবহার বিষয়ীর ন্যায় হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল ভগবৎ-প্রেমানুরঞ্জিত। বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর অগণিত শত শত ভক্তবৃন্দের মধ্যে রসিকভক্ত বলিয়া সর্বজনবরেণ্য ছিলেন। সার্বভৌম

জ্ঞানমার্গের পথিক। প্রেমরাজ্যের আস্বাদ তখনও তিনি পান নাই। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বকালে সার্বভৌম রায় রামানন্দের প্রেমের ভজন উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। না পারিবারই তো কথা।

জ্ঞানমার্গের বিচরণশীল পণ্ডিত সার্বভৌম জানিয়াছেন ভগবান নীরস, নির্মম, কেবল জীবের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আর রায় রামানন্দ ভগবান কৃষ্ণকে জানিয়াছেন—রসময়, প্রেমময়, আনন্দময় নিজ জন বলিয়া।

জীবে—"নাতিভর্তা, নিবাস শরণ সুহৃদ।" তাহার মত সুহৃদ জীবের অন্য কেহ নাই। তাই উভয়ের ভজন পরস্পর বিসম্বাদী।

একদা মাতৃভক্ত শিরোমণি মহাপ্রভু শচীমাতার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ নীলাচলে স্থায়ী বাসের জন্য শুভাগমন করিবার অল্পদিন মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দাক্ষিণাত্যের বহির্মুখ বিষয়াসক্ত জীবকে নামপ্রেম দিয়া উদ্ধার করাই মহাপ্রভুর মনোগত অভিপ্রায়।

মহাপ্রভু নীলাচলে আগমনাবধি পণ্ডিত সার্বভৌম মহাপ্রভুর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুতগুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে সার্বভৌম তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, তুমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছ, সেই প্রদেশে গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরের শাসনকর্তা রায় রামানন্দের সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও। তিনি রসিক ভক্ত। আমি পূর্বে তাঁহার প্রেমের ভজন উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছি, এখন তোমার দেবদুর্লভ সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়া প্রেমের ভজন পদ্ধতি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার সঙ্গী হইবার তিনি বস্তুতঃই পরম উপযুক্ত পাত্র।

মত্ত সিংহপ্রায় প্রেমাবেশে নগর সংকীর্তন করিতে করিতে স্থাবরজঙ্গম কৃষ্ণপ্রেমামৃতে সিঞ্চিত করিয়া প্রভু দাক্ষিণাত্য পথে অগ্রসর হইতেছেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥

—'এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।' কতদিন মধ্যে প্রভু গোদাবরী তীরে আসিয়া উপনীত হন।

এই সময় রায় রামানন্দ শাসনকর্তার পদোচিত লোকজন বাদ্যভাণ্ড সমভিব্যাহারে স্নানার্থে নদীতটে আসেন।

রায় রামানন্দ দেখিলেন এক অপূর্ব সন্ন্যাসী আবেগভরে নাম সংকীর্তনে রত।

"সূর্য শত সমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥"

তিনি দ্রুত আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন।

প্রভু অন্তর্যামী, পূর্বেই রায় রামানন্দকে চিনিয়াছেন। তবু বলিলেন, 'তুমিই রায় রামানন্দ ?'

রায় কহিলেন, 'তেঁহো হও দাস শূদ্র মন্দ।' বৈষ্ণব দীনতায় অনুপ্রাণিত রায়ের উপযুক্ত কথাই বটে।

যে ধর্মে—"সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে", সে ধর্মের প্রাণকেন্দ্রই তো দীনতা।

রায় রামানন্দ বিনয়ের খনি। প্রভু রায়কে আলিঙ্গন করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত তনু রায়ও মূর্ছিত। উভয়ের বরবপু স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ প্রভৃতি সাত্ত্বিকী ভাবভূষায় ভূষিত। অপূর্ব ভাব মূর্ছনায় সদা উদ্দীপ্ত।

রায়ের সঙ্গী ও শত শত সেবক এই অপার্থিব দৃশ্যে স্তম্ভিত হতবাক্।

মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের এই সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ। এই দৃশ্য তুলনারহিত।

যিনি হৃদয় দ্রবকারী গৌরলীলার এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন, যিনি লীলার স্তম্ভরূপে বৈষ্ণব মণ্ডলীতে সুপরিচিত, যাঁহার দ্বারা মহাপ্রভু, বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় রহস্য, ভাবরাজ্যের প্রেমময় ছবি প্রকট করিয়াছেন, যিনি প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ, যাঁহার অপ্রাকৃত দেহের ভজন পদ্ধতি জানিয়া একদা স্বয়ং মহাপ্রভুও বিস্মিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী ?

এইভাবে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইয়া উভয়ে উভয়ের স্তুতিগানে মুখর হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর হইতে বৈষ্ণবধর্মের গূঢ় রহস্য প্রভু রায় রামানন্দের মুখে প্রচার করেন।

একদা প্রভু স্নানকৃত্য করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় রায় রামানন্দ এক ভৃত্য সহ প্রভুচরণে উপনীত হইলেন।

প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কাহ স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

এখানে শ্রীভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি উল্লিখিত হইল,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

মহাপ্রভু ইহাও বাহ্য তথা সামান্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর রায় রামানন্দ স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি, পরে প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভজনের নিগূঢ় রহস্য প্রভু সমীপে ব্যক্ত করেন। সবশেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম গোপী অনুগা মধুর কান্তা ভজনের অমৃত-নিষ্যন্দী শ্লোক পড়েন।

প্রভু বলিলেন,

'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।' এইবার রায় চমৎকৃত, বিস্মিত হইলেন। বুঝি বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ তাঁহার হৃদয়াকাশে ফুল্লজ্যোৎস্নালেখাবৎ প্রতিভাত হইল।

তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন,

'ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥'

তৎপর রায় রামানন্দ রাধাপ্রেমের অশ্রুতপূর্ব অপূর্ব ভজনের কথা উল্লেখ করিলেন। আর তাহা শুনিয়া 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' মহাপ্রভু রাধাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে রায় রামানন্দের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে লাগিল। অপর একদিন প্রভু রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।'
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।'
'কীর্তিগণ মধ্যে জীবে কোন্ বড় কীর্তি।'

রায় কহে, 'কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলে যার হয় খ্যাতি।'
'সম্পত্তি মধ্যে জীবে কোন্ সম্পত্তি গণি।'
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী।'—

এইরূপ নানা তত্ত্ব রায় রামানন্দের মুখনিঃসৃত হইয়া আজিও সাধনপথে বিচরণশীল প্রেমিক ভক্তকে তন্ময় করিয়া রাখে।

এইভাবে বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনার শেষে রায় একদিন প্রভুকে বলিলেন,

এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ প্রভু তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা।
তার গৌর কান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা॥
অকপটে কহ প্রভু ইহার কারণ॥"

প্রভু কহে—

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥

কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমানুরঞ্জিত রায়ের মন আর প্রকৃত কথা আচ্ছন্ন করিতে পারিল না।

তিনি পরিষ্কার বলিলেন,—

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে কৈলে অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার॥

ইহা শুনিয়া ভক্তপ্রেমাধীন মহাপ্রভু মৃদু হাসিয়া নিজ অপরূপ শ্রীরূপ ভক্তের সম্মুখে প্রকট করিলেন।

তবে প্রভু হাসি তারে দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

এই অপার্থিব আনন্দঘনরূপ দেখিয়া—

রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তাঁরে হস্তস্পর্শে করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥

মহাপ্রভুর মহাকৃপালাভ করিয়া ভাবতন্ময় রায় রামানন্দ আর বিষয়কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। গৌরপ্রেম-বিহ্বল রায় রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সুস্পষ্ট বলেন,—

'আমা হইতে আর না তোমা হইবে কাজ।'

এদিকে যে মহাশক্তিধরের প্রেরণায় সমস্ত উৎকলভূমি কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত, যাহার প্রেমভক্তি-ভারতী উৎকলের গৃহে গৃহে ধাবিত হইয়া তাপদগ্ধ মানবকুটিরে শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করিতেছিল, সেই শক্তিধরের সম্যক্ বিবরণ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকটও অশ্রুত ছিল না। তিনি পূর্ব হইতেই তাঁহাকে না দেখিয়াই তাঁহার চরণে স্বীয় প্রাণ বিকাইয়া দিয়াছিলেন।

যখন তিনি রামানন্দের নিকট বিষয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিত্য সেবা ও ভজনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়ার কথা জানিতে পারিলেন, রাজা তখন প্রেমভরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ প্রভুর চরণ।
আমি ছার যোগ্য নহি তাহার দরশনে
তারে যেই ভজে তার সফল জীবনে ॥

ইহার পর হইতে আমরা দেখি রায়ের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন। তিনি কৃষ্ণকথা-রসে, কৃষ্ণনামামৃতে, কৃষ্ণ-গুণগানে দিবসরজনী বিভোর থাকিতেন।

রসিক চূড়ামণি রায় মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী, সহচর ও সেবক থাকিয়া তাঁহার অন্তলীলার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় তাঁহাকে নানা প্রকার আনন্দদান করিতেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে
গায় শোনে পরম আনন্দ ॥

রায় রামানন্দের কৃষ্ণভক্তি-ভাবিত মতি নীলাচল পুরধামের জনগণের চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। যে পথে গমন, সেই পথেই প্রত্যাগমন।

"যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥"

প্রভুর আগমনবার্তা বিদ্যুৎ গতিতে রাষ্ট্র হইল এবং নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ধাবিত হইলেন।

"প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা আনন্দ থেহ নাহি পায় ॥"
"জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥"

আনন্দ-বিভোর ভক্তগণ প্রভু-সম্মিলনে ছুটিলেন। সমুদ্রের তীরে প্রভু-ভক্তে মিলন হইল।

মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশীমিশ্রের বাসভবন তাঁহার বাসের জন্য নির্ধারিত হইল। ভাগ্যবান কাশীমিশ্র স্বীয় বাসভবন প্রভুর বাসের জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন। এই সময়েই নীলাচলবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হয়। সার্বভৌম অগ্রণী হইয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাঁহারা মহাপ্রভুকে সভক্তি বন্দনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন দ্বারা বড় কৃপা করিলেন।

"তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥"

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বরূপ দামোদর আসিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত ও সঙ্গী হইলেন। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। ইনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত; নবদ্বীপে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ছিলেন, প্রভুর সন্ন্যাসে

মর্মান্তিক ক্লিষ্ট হইয়া ৺কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ দামোদর নামে অভিহিত হন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী। গুরু-আজ্ঞা লইয়া তিনি নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি তিনি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিহ্বল থাকিতেন এবং ভক্তগণ সমীপে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর রূপে পরিগণিত হইতেন। মহাপ্রভুর অন্তরে যখন যে ভাবের উদয় হইত, এক স্বরূপ ভিন্ন অপর কেহ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। স্বরূপ অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি সংগীতে গন্ধর্ব ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। মহাপ্রভুকে নিত্য বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দ শুনাইয়া আনন্দ দিতেন। স্থূল কথা, স্বরূপের ন্যায় নিত্যসঙ্গী নিজ জন মহাপ্রভুর শত শত ভক্তের মধ্যেও অল্পই ছিলেন। এই কালেই মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঈশ্বরপুরী নির্যাণ কালে যে তাহাকে নীলাচল যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাপ্রভুকে জানান। মহাপ্রভু গুরুর কিঙ্করকে নিজ সেবকরূপে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ দ্বিধা করিলেও, গুরু-আজ্ঞা বলবান জ্ঞানে তাহাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দ তৎকাল হইতে প্রভুর একনিষ্ঠ সেবক থাকিয়া নিত্য তাহার যাবতীয় পরিচর্যাদি করিতে থাকেন।

৫

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে মহাপ্রভু নীলাচলে পুনরাগমন করিলে, উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত মিলিবার জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হন। প্রতাপরুদ্র স্বাধীন হিন্দু নরপতি। তিনি স্বীয় শৌর্যে ও বীরত্বে সমগ্র উৎকল-ভূমি প্রবল মুসলমান রাজা হোসেন শাহের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একচ্ছত্রী বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হোসেন শাহ সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রতাপও দুর্দান্ত ছিল। পরাক্রমশালী হিন্দু রাজার সহিত তাঁহার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। কিন্তু হোসেন শাহের উৎকল রাজ্যে প্রবেশের সমস্ত চেষ্টা প্রতাপরুদ্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন। মহারাজ

প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা দ্বারাও মহাপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলে রাজা সার্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর বার্তা জিজ্ঞাসা করেন।

"শুনিল যে তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা তিঁহ মহা কৃপাময়॥"

সার্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিলে রাজা বলিলেন,—

"—ভট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তা তো সত্য মানি॥"
"পুনরপি ইহঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥"

সার্বভৌম রাজাকে স্পষ্ট বলিলেন, মহাপ্রভুর দর্শনলাভ রাজার পক্ষে অতীব দুরূহ। তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী। রাজদর্শন তাঁহার পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। রাজার আগ্রহাতিশয্যে সার্বভৌম এক দিবস মহাপ্রভুকে রাজার আন্তরিক ভক্তি ও তাঁহাকে দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, মহাপ্রভু যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সার্বভৌম ভীত ও শঙ্কিত হইয়া আর কখনও এ প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করেন নাই। মহাপ্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা হেথা না দেখিবে॥"

ইহার পর রাজার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রায় রামানন্দ প্রভু-আজ্ঞায় বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যানগরের স্বীয় কর্মক্ষেত্র হইতে নীলাচলে তাঁহার সহিত নিয়ত বাস করিতে আগমন করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি এবং প্রভুকে দর্শন করিতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জানিতে পারেন। রায় রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, রাজাকে তোমার আজ্ঞা বলায় রাজা আমাকে বিষয়কার্য হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তোমার নাম শ্রবণমাত্র রাজা পুলকাবৃত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া মহাপ্রেমাবেশে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তুমি যে বেতন পাও, সেই বেতনই পাইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর চরণ ভজন কর।'

"আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কোন জন্মে অবশ্য মোরে দিবে দরশন॥"

রাজার আর্তি বর্ণনা করিতে গিয়া মহাপ্রভুর মন পরীক্ষাচ্ছলে কুশাগ্রবুদ্ধি, ব্যবহারনিপুণ রায় বলিলেন,—

'যে তাঁর প্রেম-আর্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥'

রায় রামানন্দের এই বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা যে কতকাংশে সুসিদ্ধ না হইল, তাহা বলা যায় না। প্রভু উত্তরে আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন,— "তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার॥"

ইহার কিছুকাল পর অপর এক দিবস রাজা সার্বভৌমকে ডাকিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুকে কিছু বলা হইয়াছে কি না জানিতে চাহেন। সার্বভৌম যে তাঁহার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই এবং পুনর্বার উল্লেখ করিলে মহাপ্রভু ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের তখন প্রকৃতই মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। রাজা কেবল যে কৌতূহলপরবশ হইয়া মহাপ্রভু দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়াছেন, তাহা নহে। ভক্তির উচ্ছ্বাসজনিত ইষ্টদেব দর্শনের জন্য মানব-হৃদয়ের যে স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠা, রাজার হৃদয়ে সেই পরম লোভনীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা সার্বভৌমকে ব্যথিতচিত্তে, বিষাদ-মলিন কণ্ঠে বলিলেন— "পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই না করিল তেহোঁ উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥"

এইখানে যুগপৎ মনে রাখিতে হইবে, ইহা উৎকল-রাজ্যের প্রতাপান্বিত

স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রের নিজের উক্তি। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সন্দিহান পাঠক মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সার্বভৌমের বিবরণ একাধিকবার পাঠ ও চিন্তা করিবেন।

সার্বভৌম রাজার জন্য চিন্তিত হইলেন। রাজার তীব্র অনুরাগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তিনি রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'তোমার উপর প্রভুর নিশ্চয়ই প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আর তোমার যে প্রেম দেখিতেছি, তাহাও অনন্যসাধারণ। কাজেই তোমার প্রতি তাঁহার কৃপা হওয়া অনিবার্য।' সার্বভৌম রাজাকে এক অভিনব পন্থা নির্দেশ করিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'রথযাত্রা-দিবসে প্রভু নিজ ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিষ্টচিত্তে রথাগ্রে নর্তন ও কীর্তন করিবেন। তখন প্রেমানন্দে মহাপ্রভুর বাহ্যাপেক্ষা থাকিবে না। তুমি সেই পুণ্যক্ষণে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানে তাঁহার চরণ গ্রহণ করিবে এবং ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক কয়েকটি তাঁহাকে শুনাইবে। তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে মহাপ্রভু নিশ্চয়ই আলিঙ্গন করিবেন। তোমার ভক্তির কথা রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার মন কিছুটা ফিরিয়াছে।'

ভক্তিমান উৎকলরাজের প্রতি প্রভুর এত কঠোরতা কেন, জিজ্ঞাস্য হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি রাজার অনুরাগ-উৎকণ্ঠার বিষয় তো সম্যক্ অবগত ছিলেন, তবে তাঁহাকে দর্শন দিতে এত আপত্তি কেন?

গৌরলীলা লোক-শিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসীর প্রকৃতি ও রাজদর্শন একান্ত নিষিদ্ধ। যে যুগধর্ম শিক্ষার জন্য মহাপ্রভু একদিন নিত্যসঙ্গী সুকণ্ঠ ছোট-হরিদাসকে তপস্বিনী-তুল্যা বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবী মাহিতী হইতে তুচ্ছ তণ্ডুলকণা ভিক্ষাপরাধে নির্মম ভাবে বর্জন করিয়াছিলেন এবং আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মান ভক্ত প্রয়াগে জাহ্নবী-নীরে হরিদাসের দেহত্যাগ দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল, ধর্মের সেই মহান্ আদর্শ লোকচক্ষুর সম্মুখে সর্বদা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত রাখিবার জন্য মহাপ্রভুর এই কঠোরতা—এই নির্মম অনুশাসন। কালচক্রে তাহার বিমল জ্যোতিঃ বর্তমানে মলিন বলিয়া বোধ হইতে পারে—বিষয়াসক্ত মানব আজ সার্ধ চারি শত বর্ষ পর সে মহান্ আদর্শ হইতে স্খলিতপদ হইতে পারে, কিন্তু যতদিন হিন্দুধর্ম থাকিবে—যতদিন বৈষ্ণব নাম ভারত হইতে একেবারে মুছিয়া না যাইবে—ততদিন সে আদর্শের সম্মুখে সকলকে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেই হইবে!

প্রভুর নীলাচল-প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরেই গৌড় দেশ হইতে দুই শত গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। অদ্বৈত আচার্য এই দলের অগ্রণী এবং শ্রীবাসাদি নবদ্বীপের সকল ভক্তবৃন্দই এই দলভুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর গৌরভক্তগণ নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া গৌড় হইতে সেই সুদূর নীলাচল ধামে মহাপ্রভুকে দেখিতে যাইতেন এবং চারি মাসকাল প্রভুসঙ্গে বাস করিয়া নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন করিতেন। গৌরভক্তগণের এই বাৎসরিক অভিযান তাঁহাদের গৌর-প্রীতির সম্যক্ পরিচায়ক।

প্রথম যাত্রায় রাজা প্রতাপরুদ্র যখন সংবাদ পাইলেন যে, মহাপ্রভুর নিজ জন বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিতেছেন, তিনি সার্বভৌম ঠাকুরের সহিত এক অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া বৈষ্ণবগণের পরিচয় জানিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। গোপীনাথ সকলকেই চিনিতেন। তিনি একে একে পরিচয় দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দর্শনে রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর।"

মহাপ্রভু যে নাম-কীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং গৌরভক্তগণ গার্হস্থ্য-লীলায় তাঁহার সহিত যে প্রাণোন্মাদকর কীর্তনে গৃহ-পরিজন বিস্মৃত হইয়া সারা নিশি শ্রীবাস-অঙ্গনে যাপন করিতেন, আজ মহাপ্রভুর দর্শনপথে নীলাচল-নিকবর্তী হইয়া ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ করতালে সেই মধুর কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সকলে আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছেন। সে আনন্দতরঙ্গ সকলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিস্মিত প্রতাপরুদ্র—বিস্মিত সার্বভৌম নির্নিমেষ নয়নে এই অদ্ভুত কীর্তন ও নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র কীর্তনের ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু সে উদাত্ত স্বর-লহরীর মধুর ঝঙ্কারে অট্টালিকায় থাকিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন। তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন—

"ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"

কিন্তু প্রতাপরুদ্রের বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাঁহার আজন্মপোষিত সংস্কারগুলিকে মথিত করিয়া তুলিল। তিনি দেখিতেছেন, ভক্তগণ পুরীধামে

পদার্পণ করিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখী না হইয়া, মহাপ্রভু প্রেরিত স্বরূপ ও গোবিন্দ সনে তাঁহার বাসভূমির প্রতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে। ভক্তগণ যখন নরেন্দ্র-সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ তৎকালে মহাপ্রভু প্রেরিত মালা প্রসাদ দ্বারা সকলকে অভিনন্দিত করিলেন। রাজা পুনরায় সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া এই সকল ভক্তগণ সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেব দর্শন না করিয়া কোথায় যাইতেছেন এবং ইহার কারণই বা কি? সার্বভৌম উত্তরে বলিলেন—

"……এই স্বাভাবিক প্রেম রীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া॥"

রাজা আজ্ঞা দিলেন, ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ বাসা, প্রসাদ ও দর্শনে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। পরিজনকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা যেন সতত নিকটে থাকিয়া সাবধানে প্রভুর ইঙ্গিতমাত্র সর্বকার্য সমাধান করে। বৈষ্ণবগণ সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রগৃহ পথে অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রভু স্বয়ং মহাবঙ্গে সকলের সহিত মিলিত হইলেন। অদ্বৈত-ভবন হইতে বিদায় লইবার পর প্রভু-ভক্তে এই প্রথম সাক্ষাৎ। বিরহক্লিষ্ট ভক্তগণের এই মিলনে যে ভাবের উৎস প্রবাহিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রথমেই বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন এবং প্রেমানন্দে উভয়ে অস্থির হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ একে একে প্রভুর চরণরেণু গ্রহণে পবিত্র হইলেন। মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন দান কালে মুরারি চকিতে পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া বলিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥"

প্রভু উত্তরে বলিলেন "মুরারি দৈন্য সংবরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" এই অভিযানে নামযজ্ঞের মহাসাধক যবন হরিদাসও ছিলেন। হরিদাস দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া রাজপথ প্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিলে হরিদাস বলিয়া পাঠাইলেন—

"……মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥

নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাও।
তাহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাও॥

হরিদাসের দৈন্য মহাপ্রভুর মর্মান্তিক হইল। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর ভক্তগণ দীনতার প্রতিমূর্তি। কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান লক্ষণ এই দীনতা।—যাহাতে "সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে"—গৌর ভক্তবৃন্দের প্রতি অঙ্গে প্রকাশ পাইত।

ভক্তবৃন্দের বাসার সংস্থান হইল। হরিদাসের পৃথক বাসের জন্য প্রভু কাশীমিশ্রের নিকট নির্জন স্থান চাহিয়া লইলেন। প্রভু হরিদাস সহ মিলিত হইতে আসিলেন। হরিদাস তখন প্রেমভরে নাম কীর্তন করিতেছিলেন। প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া পড়িতেই প্রভু তাহাকে উঠাইয়া সপ্রেম আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিতে লাগিলেন প্রভু আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি নীচ, অস্পৃশ্য, পামর—তোমার আলিঙ্গনের যোগ্য নহি।

উত্তরে প্রভু বলিলেন, নিজে পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার পবিত্র ধর্ম আমাতে নাই। এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক পাঠ করিলেন—

'অহো বত স্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহারা তোমার নাম লয়েন, তাহারাই তপস্বী তাহারাই হোমকারী তাঁহারাই সদাচারী আর্য ও বেদাধ্যায়ী।

(শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয়, ৩৩।৭)

নাম কীর্তনই যুগধর্ম। অন্নগতপ্রাণ ক্ষণভঙ্গুর দেহ কলির জীবের পক্ষে ভগবৎ নাম কীর্তনই যে সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন, ইহাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহাপ্রভু বিদ্বজ্জন-মুখরিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নাম মহিমা তিনি বহুবার বহু প্রকারে প্রচার করিয়াছেন। 'অভিন্নাত্মানাম নামিনঃ"—এই মহাবাণী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া জীবকে আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হইতে মনকে সংবরণ করিয়া একাগ্র করিতে না পারিলে ভগবদ-ভজন সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ একাগ্রতাই সাধন-জগতের মূল রহস্য। যোগের

প্রক্রিয়া দ্বারা মনের এই একাগ্রতা সহজে লাভ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই যোগসাধন-পথ এত প্রশস্ত। কিন্তু অপর দেহের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ সম্ভবপর নহে, তাই মহাপ্রভু যুগোপযোগী নাম-কীর্তনরূপ সাধনার সহজ পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। "নামে বিবেক-বাতাস খেলে, নামেই ভক্তি-রতন মিলে"—ইহা ধ্রুব সত্য। চিত্তের স্থৈর্য আনিতে, বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী করিতে এমন সহজ উপায় আর নাই।

হরিদাস কাশীমিশ্রের প্রদত্ত নির্জন স্থানে বাসা পাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণসহ আনন্দে সমুদ্রস্নান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত। বিশেষতঃ পুণ্যতীর্থ পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর দেবদুর্লভ সঙ্গলাভে তাঁহারা যে আনন্দের আস্বাদ পাইতেছিলেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য। সন্ধ্যাসমাগমে মহাপ্রভু নিজ জন সনে জগন্নাথ-মন্দিরে সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন।

"চারিদিনে চার সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥"

*　　*　　*　　*

কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥"

নীলাচলবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব সে অদ্ভুত কীর্তন দেখিতে ধাবিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমন্দির বেড়িয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথ-মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু নৃত্য করিতেছেন আর তাঁহার নয়নাশ্রুতে চতুর্দিকস্থ দর্শকবৃন্দ স্নাত হইতেছে। প্রভুর প্রেমবিকার দর্শনে সমবেত লোকসমূহ প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া কীর্তন দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব নৃত্যদর্শনে তাঁহার উৎকণ্ঠা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রাজা সার্বভৌকে পুনরায় এক পত্রী পাঠাইয়া জানাইলেন—

"প্রভুকৃপা বিনু মোর রাজ্য নাহি ভায়॥"
"যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইয়া ভিখারী॥"

পত্রী পাইয়া সার্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। তিনি পত্রের মর্ম সকল ভক্তগণকে জানাইলেন এবং তাঁহারা নিত্যানন্দকে অগ্রণী করিয়া প্রভুর নিকট

রাজার আন্তরিক অবস্থা নিবেদন করিলেন। রাজার অবস্থা বিদিত হইয়া প্রভুর মন কোমল হইলেও, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুর একখণ্ড বহির্বাস প্রসাদস্বরূপ রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন।

"বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন।"

রায় রামানন্দও প্রভুকে রাজার সম্বন্ধে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে প্রভু রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন। "শ্যামলবরণ"—পীতাম্বরধারী প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের সহিত মিলনে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি হইল এবং আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হইল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥"

ভাগ্যবান্ রাজপুত্র জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যফলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করিয়া—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে ক্রন্দন।"

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেও প্রেমাবিষ্ট হন।

গৌরলীলায় এইরূপ আবিষ্টতার নিদর্শন প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু যাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া আলিঙ্গন দান করিতেন, সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত এবং তাহার আলিঙ্গনে অপরে পুনরায় তদ্রূপ সমভাবে প্রেমাবিষ্ট হইত।

মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম যে এত দ্রুত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল, ইহার মুখ্য কারণ এই শক্তি সঞ্চার। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালেও তিনি এইরূপে অত্যল্প-কালের মধ্যে সমগ্র দেশ বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

এই শক্তি সঞ্চার অমানুষী। যুগধর্ম প্রচারের জন্য ইহার সৃষ্টি।

গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে নীলাচল আগমন করিয়া চারি মাস কাল প্রভুসঙ্গে বাস করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হিন্দুর মহাপর্ব। শত শত ধর্মপ্রাণ নরনারী এই পর্বোপলক্ষে প্রতি বৎসর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের রথাগ্রে প্রেমাবেশে নর্তন ও কীর্তন মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার এক প্রধান অঙ্গ। রথযাত্রা নিকটবর্তী হইলে মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির-মার্জন সেবা মাগিয়া লইলেন। শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী গুণ্ডিচা দেবীর নামানুসারে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে, গুণ্ডিচা দেবী রথযাত্রায় জগন্নাদেবকে এই মন্দিরে আনয়ন করিতেন। অদ্যাবধি সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। জগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণপূর্বক গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। মন্দির মার্জন প্রভুর যোগ্য সেবা নয়। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মহাপ্রভুকে এই সেবার ভার দিতে প্রথমতঃ কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নিজগণসহ সানন্দে এই নীচ সেবাই বরণ করিয়া লইলেন। গুণ্ডিচা-মন্দির সুচারুরূপে পরিষ্কৃত ও জলদ্বারা ধৌত ও মার্জিত হইল। গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন—ভগবানের সেবায় উচ্চ নীচ নাই। সেবামাত্রই বরেণ্য। যাহা সাধারণ লোকচক্ষুর নিকট তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ভক্তের নিকট তাহাও অতি আদরের। অতঃপর জগন্নাথদেবের "নেত্রোৎসব" আরম্ভ হইল। স্নানযাত্রাবসানে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ এবং চক্ষুদান উপলক্ষে পঞ্চদশ দিন দর্শন বন্ধ থাকে, সেই উৎসবই "নেত্রোৎসব" নামে অভিহিত। পঞ্চদশ দিন জগন্নাথদেব দর্শন না পাইয়া প্রভু মহাদুঃখে ছিলেন। উৎসবাবসানে প্রভু উৎকণ্ঠায় শ্রীমুখ দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন; প্রভু দেখিতেছেন—

"প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল।
নীল মণি দর্পণকান্তি করে ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥"

মহাপ্রভু তো বিগ্রহমূর্তি দেখিতেছেন না, তিনি যে সেই কোটি মনমথ-

মনমথ-প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতেছেন। দর্শনে মহাপ্রভুর কি অবস্থা হইতেছে ?

"শ্রীমুখ-সৌন্দর্যমধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে পানে ॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥"

ধীরে ধীরে রথযাত্রার পুণ্যতিথি সমাগত হইল।

যে পরম মোহন নৃত্য একবার মাত্র দর্শনে জীবের বাসনা-মলিন মন নির্মল হইয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় হইত—বহির্মুখী মানবের সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যের অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতি উদ্ভব হইত, ৺বারাণসী-ধামে বিন্দুমাধব অঙ্গনে এক দিবস যে নৃত্যদর্শনে মায়াবাদের প্রধান উপাসক বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী জন্মজন্মান্তরের জ্ঞান-কর্মপাশ হইতে সহসা মুক্ত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং স্বকৃত পূর্বাপরাধ অশ্রুজলে ক্ষালন করিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন, প্রভু নীলাচলে এই পুণ্যতিথিতে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে সবলোকলোচনের সম্মুখে জীবের কল্যাণপ্রদ সেই মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য মানবহৃদয়ের অবরুদ্ধ আনন্দসত্বার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। অন্তর্নিহিত আনন্দ-উৎস মনের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া দেহের প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়। এই আনন্দ ভগবানের অন্যতম শক্তি 'হ্লাদিনীর'ই ক্ষীণ বিকাশ মাত্র। ভগবৎ-প্রেমানন্দাধিক্যে যে নৃত্য, তাহা জীবের স্ববশে কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। হৃদয় দ্রবকারী এই মোহন নৃত্য মহাপ্রভুই জীবকে সবপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর তুষ্টির জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র এ বৎসর রথযাত্রার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র উৎকল-ভূমি এক অভিনব আনন্দ-স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রথযাত্রার দিবস রাজা স্বয়ং সুবর্ণ-মার্জনীহস্তে পথ সম্মার্জন করিয়া চন্দনজলে তাহা অভিষিক্ত করিলেন, এই পথে ঠাকুরের রথ অগ্রসর হইল।

"রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥
শত শত শুভ্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্মল ॥

ঘাগর কিঙ্কিনি বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানাচিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥"

মহাপ্রভু 'মনিমা' 'মনিমা', বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতে লাগিলেন। নানা বাদ্য-কোলাহলের মধ্যে গৌড়দেশীয় মল্লগণ রথ টানিতে লাগিল।

"ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।" মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণকে একত্র করিয়া সকলকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে ভক্তগণের আনন্দ বৃদ্ধি পাইল, প্রভু কীর্তনের সাতটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রভাগে, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল। সাত সম্প্রদায়ে এক সঙ্গে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া উঠিল।

"যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল।"

নাম কীর্তনের মহামঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল।

"সাত ঠাঁই বলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস ॥
সব কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায় ॥"

অতঃপর প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতে মনন করিলেন। সাত সম্প্রদায় একত্রিত হইল। দশজন প্রভুর সঙ্গে গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন।

"দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধ মুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥"

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" "জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণঃ বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ॥
জয়তি জয়তি মেঘ-শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥"

আবিষ্ট হইয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইবার প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

"নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর মহীশৈল করে টলমল ॥

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
স্থবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥"

নিত্যানন্দ দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আশে পাশে সর্বত্র সন্ত্রস্ত। অদ্বৈতাচার্য হুঙ্কার করিয়া হরিবোল বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কল্লোল্লিত জনস্রোত তন্ময়চিত্তে প্রভুর নৃত্য দেখিতে ছুটিয়াছে। স্বয়ং প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণসহ লোক নিবারণে বিফল চেষ্টায় রত হইয়াছেন। প্রভুর নৃত্যে সকলেই আবিষ্টচিত্ত। রাজা বিহ্বল হইয়া নৃত্য দেখিতেছেন আর তাঁহার শরীর প্রেমময় হইতেছে। রাজার অগ্রভাগে প্রভুর নিজ জন শ্রীনিবাস আবিষ্ট হইয়া নৃত্য দর্শন করিতেছেন। রাজার অবাধ দর্শনে বিঘ্ন হওয়ায় রাজমন্ত্রী হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে একপাশে যাইতে হস্তদ্বারা বার বার ঠেলিতেছেন. শ্রীনিবাসের বাহ্যাপেক্ষা নাই, তিনি বার বার উত্যক্ত হওয়ায় দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া হরিচন্দনকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজমন্ত্রী এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু বলিতে উন্মুখ হওয়ায় রাজা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—

"ভাগ্যবান তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই তুমি কৃতার্থ হইলা ॥"

এই সামান্য ঘটনাও রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার আরম্ভ হইল। এককালে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব দেবদেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

"মাংস-ব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জ জ গ গ জ জ গ গ গদ গদ বচন ॥"

প্রভু "জগন্নাথ" পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, জ জ গ গ বলিতেই "জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল।" চতুর্দিকস্থ সমবেত লোক প্রভুর অশ্রুজলে স্নাত হইতে লাগিলেন। প্রভুর দেহকান্তি কখনও অরুণবর্ণ, কখনও আবার পরমুহূর্তেই মল্লিকা পুষ্পের বর্ণ ধারণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছিল।

কখনও বা প্রভু স্তব করিতেছেন, কখনও ভূমিতে পতিত হইয়া শ্বাসহীন হইতেছেন।

"কভু নেত্র নাসা জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥"

কখনও বা প্রভু ভাবাবেশে ভূমিতে বসিয়া অধোমুখে তর্জনী দ্বারা কৃষ্ণমূর্তি আঁকিতেছেন আর স্বরূপ অঙ্গুলী ক্ষত হওয়ার আশঙ্কায় সভয়ে নিজ করে তাহা নিবারণ করিতেছেন। প্রভু ভাব বিশেষে প্রবেশ করিতেছেন আর তদনুযায়ী নৃত্যের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ ভাব অনুযায়ী পদ ধরিতেছেন। স্বরূপ গাহিলেন—

"সেই তো পরাণ নাথ, পাইনু।" আর প্রভুও আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছেন,—প্রভুর মন এই ভাবে আচ্ছন্ন। সেই ভাব অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে মধুর কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে। প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে। নীলাচলবাসী সমবেত অগণিত যাত্রীর দল, পাত্রমিত্র সনে রাজা প্রতাপরুদ্র এই অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া প্রেমে অভিভূত হইতেছেন।

"প্রেমে নাচে গায় লোক করি কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দ-বিহ্বল॥"

কখনও প্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিতেছেন—কখনও রথের পশ্চাতে গিয়া মাথা দিয়া রথ ঠেলিতেছেন, আর হড়্ হড়্ করিয়া রথ অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রভু নিজগণ সনে মহানন্দে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন—রথ ক্রমে "বলগণ্ডীতে" উপনীত হইল।

"বলগণ্ডী" জগন্নাথদেবের মাসীর আলয় বলিয়া পরিচিত। ইহা শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার মধ্যপথে। ইহার দক্ষিণ ভাগে বৃন্দাবনতুল্য চারু পুষ্পোদ্যান। এই স্থানে রথ আসিলে জগন্নাথদেবের ভোগ হইয়া থাকে। ভক্তগণ এই স্থানে ঠাকুরকে স্বেচ্ছামত ঈপ্সিত ভোগ দিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু শ্রান্ত হইয়া বলগণ্ডীর রমণীয় উপবনে প্রেমাবিষ্টে পড়িয়া আছেন, ভক্তগণও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন। এই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের পূর্ব উপদেশমত রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন বৈষ্ণব বেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজার ভাগ্যাকাশে আজ সৌভাগ্য-সূর্য সমুদিত। যে যজ্ঞের সফলতার জন্য তিনি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও একাগ্রতা নিয়োজিত করিয়া এতকাল ব্যর্থমনোরথ

হইয়াছেন, আজ তাহার পূর্ণাহুতির দিন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ধীরে, ভীত কম্পিত বক্ষে প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইতেছেন।

ধীরে সমীরণ বহিতেছে। মৃদুমন্দ পবন ফুল্লকুসুমদামের সৌরভ-সুষমা বহন করিয়া পরিশ্রান্ত ভক্তগণকে ব্যজন করিতেছে। চতুর্দিক নীরব—এক অখণ্ড শান্তি বিরাজিত। কেবল গৌরপ্রেম-বিহ্বল একটি মহাপ্রাণ হৃদয়ের চির পোষিত আকাঙ্ক্ষা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদু পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা ভক্তগণকে যোড়হস্তে বন্দনা করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের সমগ্র শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া সাহসভরে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিলেন। রাজা নিপুণ-ভাবে প্রভুর পাদ সংবাহন করিতেছেন আর রাসলীলার "জয়তি তেঽধিকং" শ্লোক পাঠ করিতেছেন।

"শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চে বলে বার বার॥"

আশ্বাস পাইয়া নৃপতি পড়িলেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম, ৩১শ)

আবেগভরে গদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত ভাগবতের শ্লোক শ্রবণে প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বর উঠিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥"

প্রেম আজ সন্ন্যাসের কঠোর বর্ম ভেদ করিয়া চিরন্তন বিধি-নিয়ম ভাসাইয়া দিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিল। প্রেমাবিষ্ট প্রভুর এযাবৎ বাহ্যস্ফূর্তিই ছিল না এই সপ্রেম আলিঙ্গনের পাত্র যে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র—সেদিনও রথাগ্রে নৃত্যকালে ভূমিতে পড়িবার সময় যিনি সম্ভ্রমে অঙ্গ স্পর্শ করাতে বিষয়ীর স্পর্শ হইল বলিয়া প্রভু কত না আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা যেন প্রভু জানিতেই পারেন নাই। প্রভুর চক্ষু নিমীলিত। গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। প্রভু

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কে তুমি হিতকারী বন্ধু আজ আচম্বিতে অসিয়া কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ?" রাজা বলিলেন, "আমি তোমার দাসানুদাস।" রাজা আনন্দে চঞ্চল—কণ্ঠ গদগদ। হৃদয়ের সকল তন্ত্রী হইতে আজ এক সার্থকতার ললিত স্বর বাজিয়া উঠিতেছে। রাজা সকল ভক্তের বন্দনা করিয়া উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে রথ পুনর্বার গুণ্ডিচা অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর গমনের পর রথের গতি সহসা স্তব্ধ হইল। বলিষ্ঠ মল্লগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রথ টানিতে পারিল না। রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যগ্র হইয়া মত্ত হস্তিযূথ দ্বারা রথ টানাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিস্ফল—রথ এক পদও অগ্রসর হইল না, স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া রহিল। বিশ্বম্ভর জগন্নাথের রথ কে চালাইতে পারে? "ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ—না চলে কারও বলে।" যাত্রি-মণ্ডলে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

"অঙ্কশেব ঘায়ে হস্তী করয়ে চাৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥"

মহাপ্রভু নিজগণ সনে এই আকস্মিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন। এ নিদারুণ দৃশ্য আর অধিক ক্ষণ দেখিতে পরিলেন না। রথরজ্জু হইতে হস্তিযূথ মুক্ত করিয়া নিজগণকে রথ টানিতে দিলেন।

"আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হুড্ হুড্ করি রথ চলিলা ধাইয়া॥"

"জয় জগন্নাথ" বলিয়া মহানন্দে সর্বলোক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

"জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোক ধন্য ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥"

রথ গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছিল। গুণ্ডিচা মন্দিরে আগমনাবধি প্রভুর বিরহ-স্ফূর্তির অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, প্রভু এই ভাবে বিভাবিত থাকিয়া আনন্দে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান ও জলকেলিতে, দ্বিসন্ধ্যা মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তনে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

৮

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ যত দিন নীলাচলে ছিলেন, প্রভু তাঁহাদের সহ নিত্য নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান, জগন্নাথ-মন্দিরে কীর্তন ও মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দীর্ঘকালের অদর্শনজনিত বিরহ-ব্যথা প্রশমিত করিলেন। ভক্তগণও প্রভুসঙ্গলাভে নবদ্বীপের সেই বিস্মৃত দিনগুলির আনন্দোৎসব ফিরাইয়া আনিলেন। কাহারও আর কোন ক্ষোভ রহিল না।

রথযাত্রা অবসানে গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ বণ্টন করিয়া লইলেন। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে তাঁহাদের এত ঐকান্তিক আগ্রহ যে, এক একদিন তিন চার জনের আহ্বান একত্র হইত। ভক্তগণ প্রভুসনে কিরূপে দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ দিব। রায় রামানন্দ ও পণ্ডিত সার্বভৌম উভয়েই পরিণতবয়স্ক ও গম্ভীর। বিশেষতঃ উৎকলে তাঁহাদের পদমর্যাদানুযায়ী মান-সম্ভ্রমও প্রচুর। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম উভয়কে গলাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য তরলমতি বালকের চপলতায় পরিণত হইয়াছে। এক দিবস ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ইঁহাদের চঞ্চল জলকেলি দেখিয়া প্রভু স্মিত মুখে গোপীনাথকে বলিলেন—

"পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য-চাঞ্চল্য করে করহ বর্জন॥"

গোপীনাথ উত্তরে বলিলেন—

"প্রভু তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু মন্দার পর্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ড শৈল ইঁহার কা কথা॥"

ভক্তগণ নীলাচলে জগন্নাথদেবের নানাবিধ উৎসব দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-জন্মতিথিতে নন্দ-মহোৎসব হইল—সকলে মহানন্দে তাহাতে যোগদান করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের নীলাচল ত্যাগের দিন সমাগত হইল। প্রভু সকলকে একত্র করিয়া প্রতি ভক্তকে মধুর বচনে অভিভূত করিলেন।

শ্রীবাসকে বলিলেন, "শ্রীবাস মাতাকে এই বস্ত্রখানা দিও। তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া আমার সর্বাপরাধ ক্ষমা করিতে বলিও।"

"তাঁর প্রেমবশ আমি তাঁর সেবাধর্ম্ম।
তাঁহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥"

মাতাকে বলিও, "আমি নীলাচলে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে তাহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকি।"

"যেদিন তিনি নানা প্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেন এবং প্রসাদ কোলে লইয়া 'আমার নিমাঞির প্রিয় এ সব ব্যঞ্জন' বলিয়া পুত্র-স্নেহ-বিগলিতকণ্ঠে রোদন করিতে থাকেন, আমি অলক্ষিতে গিয়া তাহা ভোজন করিয়া আসি। মাতা তাহা জানিতে পারেন না, শূন্য পাত্র দেখিয়া ভাবেন কেহ বা আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছে।" মাতার কথা বলিতে বলিতে প্রভু বিহ্বল হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাপ্রভু মাতৃভক্ত-শিরোমণি। সন্ন্যাসের নির্মমতা সে ভক্তির উৎস বিন্দুমাত্রও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময় কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁকে প্রভু প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের রথের পট্টডোরী আনিবার সেবা প্রদান করেন। সত্যরাজ প্রভুকে বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, আমরা গৃহস্থ বিষয়ী, আমাদের সাধন কি প্রকারে হইবে, শ্রীমুখে আজ্ঞা কর।"

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

সত্যরাজ বলিলেন, "বৈষ্ণব চিনিব কেমনে"—বৈষ্ণবের লক্ষণ কি? উত্তরে প্রভু বলিলেন—

"—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবার উদ্ধারে॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥"

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দের প্রেম নির্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম।" ময়ূরপুচ্ছের আড়াণি* দৃষ্টে মুকুন্দের যে শ্রীকৃষ্ণের

* আড়াণি—বড় পাখা।

উদ্দীপন হইয়াছিল এবং তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ করিলেন। মুরারি গুপ্তের ভজননিষ্ঠা ও চিত্তের দৃঢ়তা উল্লেখ করিয়া প্রভু প্রশংসমান বদনে তাঁহার গুণ-কীর্তন করিলেন। বাসুদেবের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া প্রভু সহস্রবদন হইলেন। লজ্জিত বাসুদেব প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন—"প্রভু, জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সকল জীবের পাপ, প্রভু, আমাকে বহন করিতে দাও—আমি সকলের পাপের বোঝা সাদরে মস্তকে লইয়া চিরকাল নরক ভোগ করি—জীবকে তুমি ভবরোগ হইতে মুক্ত কর।" জীবের প্রতি বাসুদেবের এই মহান্ উদারতা ও প্রীতি মহাপ্রভুকে বিচলিত করিল। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—"বাসু, ভক্ত যে প্রার্থনা করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি ব্রহ্মাণ্ড জীবের নিস্তার বাঞ্ছা করিতেছ, কাজেই বিনা পাপ ভোগেই সকলের উদ্ধার হইবে।"

"অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥"

একই ডুম্বুর বৃক্ষে যেমন বহুফল থাকে, সেরূপ সীমাশূন্য বিরজার জলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে—এক ফল নষ্ট হইলে যেমন বৃক্ষের কোন অপচয় হয় না—

"তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥"

গৌরলীলায় বিশ্বাসপরায়ণ ভক্ত পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বাসুদেবের এই আন্তরিক প্রার্থনা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল। "আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ" যে-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য, "পাপী নীচ উদ্ধার" তাহার আনুষঙ্গিক গৌণ কর্ম্মমাত্র।

ভক্তগণের গুণ-কীর্তন করিয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন দানে পুলকিত করিয়া প্রভু সকলকে বিদায় দিলেন।

"প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥"

গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলে এক দিবস সার্বভৌম ঠাকুর প্রভুকে মাস ভরিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুনয় করেন। প্রভু "নহে

যতি-ধর্ম চিহ্ন” বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সার্বভৌম ক্রমে বিশ, পঞ্চদশ, দশ দিবস প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রভু তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর মাসে পঞ্চদিন সার্বভৌমগৃহে প্রভুর ভিক্ষার নিয়ম হইল। সার্বভৌমের বড বাসনা তিনি প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অমর্যাদা আশঙ্কা করিয়া সার্বভৌম এত দিবস স্বগৃহে প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সার্বভৌম প্রভুর ভিক্ষার জন্য নিভৃতে এক নব-গৃহই নির্মাণ করিয়াছেন। ভিক্ষার দিন নির্ধারিত হইল। সার্বভৌম-পত্নী, “প্রভুর মহা ভক্তা তেঁহো—স্নেহেতে জননী” আনন্দে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিবিধ প্রকার, সুস্বাদু বস্তু প্রস্তুত হইল। প্রভুর শাকে বিশেষ প্রীতি, সার্বভৌম-পত্নী তাই দশ প্রকার শাকই রন্ধন করিয়াছেন। মোচা-ঘণ্ট, মোচা-ভাজা, “নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্তকী”—প্রভুব যাহা যাহা রুচিকর-- সমুদয়ই হইয়াছে। নানাপ্রকাব সন্দেশ পিঠাপানা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্ত আজ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া ইষ্টদেবকে ভোজন করাইতেছে, কাজেই পূর্ণ মাত্রায় আয়োজন। প্রভু মধ্যাহ্নকালে সার্বভৌমের প্রার্থনানুযায়ী একাকী সার্বভৌম-গৃহে উপনীত হইলেন এবং পদপ্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিলেন।

সার্বভৌমগৃহে তাঁহার জামাতা অমোঘ বাস করিত। অমোঘ মূর্খ, নির্বোধ, পরান্নভোজী। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাহার যে কোন ধারণা ছিল, তাহা বোধ হয় না। যে লীলার প্রেমতরঙ্গ সমগ্র উৎকল ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়া নীলাচলকে ভাসাইয়া লইতেছিল—স্বীয় আশ্রয়দাতা শ্বশুরালয়ে যাহার নিত্যকুট উঠিয়া সকলকে অপার্থিব ভাবাবেশে অভিভূত করিয়া রাখিত, অনভিজ্ঞ অমোঘকে তাহা এ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল এই অস্থিরচিত্ত যুবক অকস্মাৎ মহাপ্রভুর ভোজন-মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইল, অন্নের পরিমাণ দেখিয়া দুর্মুখ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—

“এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥”

এই বাক্য মুখনিঃসৃত হওয়া মাত্রই সার্বভৌমের রুদ্র-নেত্রের চাহনীতে অমোঘ শিহরিয়া উঠিয়া দ্রুত স্থান ত্যাগ করিল। ভট্টাচার্য লাঠি লইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অমোঘের বাক্যে প্রভু কিঞ্চিত হাস্য করিলেন মাত্র।

কিন্তু সার্বভৌম ও তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে এই দুর্বাক্য তীক্ষ্ণ শেলসম বিদ্ধ হইল।

"শুনি ষাঠীমাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাঠী * আজ রাঁড়ী হউক বলে বারে বারে॥"

স্নেহময়ী মাতা গৌরনিন্দায় বিচলিত হইয়া স্বীয় প্রাণপ্রতিম একমাত্র দুহিতার বৈধব্যকামনা করিতেছেন। কি চিত্র! সার্বভৌম পত্নীকে বলিলেন, আজ হইতে আর সে নিন্দুকের মুখ দেখিব না—নাম লইব না; চৈতন্য গোসাঞিকে যে নিন্দা করে, তাহাকে বধ করিলে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। ষাঠীকে বল, তাহার পতি পতিত, তাহাকে ত্যাগ করাই শাস্ত্রানুমোদিত।

এদিকে অমোঘ পলাতক। রাত্রিতে তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রভাতে মহাপ্রভু শুনিলেন, নির্বোধ অমোঘ বিসূচিকা রোগে মহাযাত্রার পথে অগ্রসর। পরম কারুণিক প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুত আসিয়া অমোঘের রোগক্লিষ্ট দেহের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, পদ্মহস্তে আসন্ন মৃত্যুর ঘনীভূত করালছায়া অমোঘের বিবর্ণ মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত করিয়া তাহার বুকে হস্ত দিয়া বলিলেন—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিবার এই যোগ্য স্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
*　　　*　　　*
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥"

এই মহাবাণী অমোঘের প্রতি ধমনীতে করুণার পবিত্র ধারা ঢালিয়া দিল। উচ্ছৃঙ্খল অমোঘ মহাপ্রভুর হস্তস্পর্শে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইল আর তৎসঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবসম্পদ লাভ করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। অমোঘের পুনর্জ্জন্মই হইল। প্রভুর চরণ ধরিয়া অনুতাপবিদ্ধ যুবক কাতরে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং যে অপবিত্র মুখে প্রভু-নিন্দা বহির্গত হইয়া ভক্ত-হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে, তাহা নিদারুণ আঘাতে ফুলাইয়া ফেলিল। এই অমোঘ পরে মহাপ্রভুর একজন একান্ত ভক্ত

* সার্বভৌম-দুহিতা ষাঠী স্বামীসহ পিতৃগৃহে বাস করিতেন।

ও দেশপূজ্য আচার্যের আসন প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। সার্বভৌম অমোঘের প্রতি এই কৃপার আনুপূর্বিক ইতিহাস অবগত হইয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"মরিত অমোঘ তারে কেন জিয়াইলা।"

পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুকে কি চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা বিশদরূপে অনুশীলনের জন্য এই প্রস্তাব বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইল।

৯

অতঃপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হন। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সংকল্প অবগত হইয়া বড় বিমনা হইলেন। রায় রামানন্দ ও সার্বভৌমকে ডাকাইয়া রাজা বলিলেন, তাঁহারা উভয়ে যেন প্রভুকে নীলাদ্রি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে না দেন।

"তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥"

রামানন্দ ও সার্বভৌম প্রভুর বিচ্ছেদাশঙ্কায় পূর্ব হইতেই ম্রিয়মান ছিলেন—রাজার আদেশে বা অনুরোধে প্রভুর বৃন্দাবন গমনে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় বর্ষ সমাগত হইল এবং গৌড়ের ভক্তগণ পুনরায় নীলাচল রওনা হইলেন। এবারে গৌড়ীয় গৃহস্থাশ্রমী অনেক ভক্তই সপত্নীক নীলাচল যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেনের এক বালক পুত্রও পিতামাতার সহ চলিয়াছে—"তেঁহো চলিতেছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।"

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর বৎসরোপযোগী নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এক বিশালকায় "ঝালী" সাজাইয়া মাথায় করিয়া চলিয়াছেন। এই বিচিত্র ঝালী বৈষ্ণবমণ্ডলে "রাঘবের ঝালী" বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণববন্দিতা পূজনীয়া আচার্য-গৃহিনী, শ্রীবাসপত্নী মালিনী, শিবানন্দ সেনের পত্নী সকলেই প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। ইঁহারা প্রভুর প্রিয় জিনিস সেই সুদূর নীলাচলে সাদরে বহন করিয়া লইতেছেন। পুরীসন্নিধানে আঠার নালায় আসিলে গোবিন্দ প্রভুদত্ত

মাল্য-চন্দনে ভক্তগণকে সম্বর্ধনা করিলেন। ভক্তগণ নাচিতে নাচিতে কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভু নরেন্দ্র সরোবরের তীরে ভক্তগণ সহ মিলিত হইলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিলেন। পূর্ববারের ন্যায় এবারও সকলের বাসার সংস্থান হইল। পূর্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্য ও কীর্তন হইল। সেই আনন্দ—সেই উৎসাহ—সেই প্রেম পূর্ববারের মতই সকলকে অভিভূত করিল। এ যাত্রার অভিযানের বিশেষত্ব ভক্তিমতী বৈষ্ণবগৃহিণীগণের নীলাচল আগমন। নীলাচল গমন তখন সহজসাধ্য ছিল না। ভক্তির কত প্রবল উচ্ছ্বাসে অসূর্যম্পশ্যা হিন্দুললনাগণের সর্ববিধ ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া পদব্রজে বঙ্গভূমি হইতে উৎকলের সেই প্রান্তসীমায় যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা কঠিন। প্রভু প্রায় নিত্যই ভক্তগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। অনেকেই প্রভুর প্রিয় জিনিস বাড়ী হইতে বহিয়া আনিয়াছেন।

"প্রভুর ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী॥"

নিত্যানন্দকে প্রভু এবারে বলিলেন—"শ্রীপাদ, তুমি প্রতি বর্ষে নীলাচলে আসিও না—আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি নিয়ত গৌড়ভূমিতে বাস করিয়া জীবকে নাম, প্রেম বিতরণ কর। এবারেও সত্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দাও"। উত্তরে প্রভু বলিলেন—

"বৈষ্ণব-সেবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"

এবারেও সত্যরাজ বৈষ্ণবের লক্ষণ জানিতে চাহিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥"

প্রভু পূর্ববারে বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে যে ভক্তগণের সন্দেহ বিদূরিত হয় নাই, তাহা বর্ষান্তরে পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা প্রকাশ পাওয়ায় বোধ হয় প্রভু হাস্য করিয়াছিলেন। বর্ষান্তরে বৈষ্ণবের তারতম্য শিক্ষা দিতে গিয়া প্রভু পরিশেষে বলিলেন—

"যাহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণ-নাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"

এক মহাপ্রভু ব্যতীত—যাঁহার প্রেম-কান্তি দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্রই জীবের মলিন জিহ্বায় "হরিনাম" ফুটিয়া উঠিত—অপর কেহ "বৈষ্ণব-প্রধানের" এই সংজ্ঞাভুক্ত হইবেন কি না সন্দেহ। এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রভু অতর্কিতভাবে স্বীয় স্বরূপেরই আভাস প্রদান করিলেন।

এই প্রকারে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বর্ষে নীলাচলে আগমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বৎসরে ভক্তগণ রথযাত্রা অন্তে নীলাদ্রি ত্যাগ করিলে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারাও আর বেশী হঠ্ করা সঙ্গত নয় বিবেচনায় তেমন আপত্তি করিলেন না। প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার এই দ্বিতীয় উদ্যম। প্রথম বারে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে রাঢ় দেশ দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখী হইলে, নিত্যানন্দ যে তাঁহাকে ভুলাইয়া অদ্বৈত-ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। এবার বিজয়া দশমী তিথিতে প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার দিন অবধারিত হইল। ধীরে ধীবে বিজয়া দশমী তিথি সমাগত ও আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় ভক্তমণ্ডলী ম্রিয়মান হইলেন। নীলাচলবাসী গৌড় ও উৎকলের অসংখ্য ভক্ত বিচ্ছেদ অসহনীয় জ্ঞান করিয়া প্রভুর সঙ্গ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নির্ধারিত তিথিতে প্রভু জগন্নাথদেব দর্শন ও প্রদক্ষিণ কবিয়া নীলাচল ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পথে ভ্রমণ ও তৃতীয় উদ্যমে বৃন্দাবন পরিভ্রমণের রমণীয় কাহিনী বর্তমান আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে। তাহা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইল।

দ্বিতীয় উদ্যমে প্রভু কানাই-নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হন। ফিরিবার পথে গঙ্গাতীরে গৌড়ীয় প্রধান প্রধান ভক্তগণের গৃহে পদধূলি দিয়া দ্রুত নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াই বৃন্দাবন যাইবার জন্য পুনরায় উদ্বিগ্ন হ'ন। গতবারে তিনি গৌড়ীয় ভক্তগণকে এ বৎসর রথযাত্রা-কালে নীলাচল যাইতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই গৌড়ীয় ভক্তগণের বাৎসরিক অভিযানের জন্য আর প্রভুকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। তিনি অবিলম্বে বৃন্দাবন রওনা হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সনে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা সম্বন্ধে নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিলেন। পূর্ব বারে সঙ্গীয় লোকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রভুকে বড় অশান্তি উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই অশান্তি বৃন্দাবন পথে তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনে এত অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল যে, প্রভু সনাতনের একটি কথায়

দ্বিতীয় উদ্যমে আর অগ্রসর না হইয়া কানাই-নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি এবার পূর্বাহ্ণেই প্রকাশ করিলেন—

"একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব।"

বৃন্দাবন পথে প্রভুর বাহ্য স্ফূর্তি থাকে না। তিনি বিহ্বলচিত্তে পথে ছুটিতে থাকেন—উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশ অহর্নিশ তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখে। এই অবস্থায় দূরদূরান্তের পথে তাঁহাকে নিঃসঙ্গী যাইতে দেওয়া যে কোন ক্রমেই সমীচীন নহে, ভক্তগণ তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। পথে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সঙ্গী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। স্থির হইল বলভদ্র ভাটাচার্য নামক এক সাধু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে যাইবেন এবং সেবাদির জন্য ভট্টাচার্যের এক বিপ্রভৃত্যও যাইবে। প্রভু এ বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন। প্রভু শেষ রাত্রে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। প্রভু প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঝাড়িখণ্ডের নিবিড় অরণ্যপথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপথে ৺বারাণসী ধামে বৈদান্তিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কঠোর জ্ঞানকর্মপাশ হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমভক্তির রাজ্যে লইয়া আসেন এবং তৎপূর্বেই প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপগোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ববিধ শিক্ষা প্রদান করেন। ক্রমে প্রভু পুরীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলভদ্র ভটাচার্যকে ভক্তগণ আহ্বানে পাঠাইয়া দিলেন।

"শুনি ভক্তের গণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলা যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা॥"

ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভু দর্শনে ধাবিত হইলেন। নরেন্দ্র-সরোবর-তীরে প্রভু-ভক্তে মিলন হইল। ভক্তগণ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। দীর্ঘ দিনের বিরহানল করুণার প্লাবনে নির্বাপিত হইল। সভক্ত মহাপ্রভু আনন্দে জগন্নাথ দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মৃতকল্প পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভু আগমনে আবার সজীব হইয়া উঠিল। প্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমনের সংবাদ গৌড়ে প্রেরিত হইলে, গৌড়ীয় ভক্তগণ আবার মহানন্দে প্রভু দর্শনে নীলাচল যাত্রা করিলেন। এই সময় রূপগোস্বামী নীলাচলে আগমন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের বাসভবনে অবস্থান করেন। হরিদাস রূপের সঙ্গলাভে পুলকিত হন। রূপের নীলাচল আগমন অবগত হইয়া এক দিবস প্রভু রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ হরিদাসের বাসস্থলে উপস্থিত হইলেন। রূপগোস্বামী সকল ভক্তকে বন্দনা করিলেন। প্রভু-

আজ্ঞায় রূপ বৃন্দাবন আসিবার পূর্ব হইতে কৃষ্ণলীলার দ্বিতীয় খণ্ড নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাটকের মঙ্গলাচরণ, নান্দী-শ্লোক বৃন্দাবনেই লিখিত হয়। তৎপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তিতে ব্যথিত হইয়া রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ দর্শন মানসে নীলাচল গমন করেন। রূপগোস্বামী পরম পণ্ডিত। তিনি যে কৃষ্ণলীলা নাটক প্রণয়ন করিতেছেন, এ সংবাদ বৈষ্ণব-মণ্ডলে শীঘ্রই প্রচারিত হইল। এক দিবস মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ হরিদাস-মন্দিরে আগমন করিয়া কহিলেন—

"কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক॥"

রূপ পড়িলেন—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়-কডম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

("কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণে যে কি অমৃত আছে, জানি না। রসনায় এই শব্দ উচ্চারিত হইলে রসনারাশি লাভের কামনা হয়, কর্ণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ লাভের বাসনা হয়, মনে প্রবেশ করিলে যাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাভূত হয়।)

নাম-মহিমা জ্ঞাপক এই অপূর্ব শ্লোক শ্রবণে ভক্তবৃন্দ আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন—

"নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥"
"নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি"—

বলিয়া নাম-সাধক ঠাকুর হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রূপ, এ কোন্ মহাগ্রন্থ করিতেছ, যাহার মধ্যে এমন সিদ্ধান্তের খনি আছে।" স্বরূপ রূপগোস্বামীকৃত নাটকের সম্যক্ পরিচয় দিলেন। অতঃপর ভক্তগণ নাটকের অন্যান্য শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। রায় কহিলেন—"ইষ্টদেবের বর্ণনা কি করিয়াছ, পড় রূপ!" রূপ সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি ভক্তবৃন্দের নিকট এখনও এমন পরিচিত হন নাই, পরস্পরের প্রতি এখনও সেরূপ ভাব-বিনিময় হয় নাই। নীলাচলের

ভক্তাগ্রগণ্য রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির সম্মুখে শ্লোক পড়িতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া রূপ পড়িলেন—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

গৌরভক্তের চির আদরের কলিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের মহান্ উদ্দেশ্য-পরিজ্ঞাপক এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তগণ সমস্বরে বলিলেন—

"কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া।"

রায় কহিলেন, "রূপ, তোমার কবিত্ব 'অমৃতের ধার।' দ্বিতীয় নাটকের নান্দী-শ্লোক পাঠ কর।" সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী পড়িলেন—

"নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু॥"

(যিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অজস্র প্রেমসুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি "দ্বিজরাজকুলাধিরাজ"—যিনি অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক—যিনি জগতের চিত্তহারক, সেই শচীনন্দন আমার আনন্দ বিধান করুন।)

শ্লোক শুনিয়া প্রভু কিছু রোষাভাসে বলিলেন, "রূপ, তোমার অপূর্ব কৃষ্ণরস-কাব্যসুধা-সিন্ধুমধ্যে এই মিথ্যা স্তুতি ক্ষারবিন্দু কেন প্রক্ষেপ করিয়াছ?" রায় উপস্থিতই ছিলেন, তিনিও কম রসিক নহেন। রায় তৎক্ষণাৎ পুলকিত কণ্ঠে বলিলেন—

"রূপের বাক্য অমৃতের পুর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥"

প্রভু বলিলেন—"রায়, লোক-উপহাসাস্পদ এই শ্লোক শুনিয়াও কি তোমার উল্লাস হইতেছে?" রায় উত্তর করিলেন—

"—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥"

রূপগোস্বামী সর্ব ভক্তের প্রীতিভাজন হইয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দোলযাত্রা অন্তে প্রভু তাঁহাকে আদেশ দিলেন—

"ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণ সেবা রস ভক্তি করিও প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥"

রূপগোস্বামী প্রভু-চরণ শিরে ধারণ করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

১০

মহাপ্রভু জীবকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল ধর্মজগতের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে প্রকাশমান থাকিয়া সাধনমার্গের বিভ্রান্ত পথিককে সুদীপ্ত ঋজু পথ দেখাইয়া দিবে। স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন তাঁহার অনুশাসনের অন্যতম—প্রধানতম বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভক্তিবিরোধী বলিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সনাতনকে শিক্ষাদান কালে প্রভু বলিতেছেন—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর॥"

এই অনুশাসন তিনি নিজে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পর নিত্যানন্দ যখন তাঁহাকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া অদ্বৈতগৃহে আনিয়াছিলেন, তৎকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আর সকলের শান্তিপুর হইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন —শুধু একজন ব্যতীত।

প্রভু যাঁহার হৃদয়-সর্বস্ব, জীবন-সম্বল, কেবল তিনিই তাঁহার দর্শনের অধিকারিণী ছিলেন না। তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী-সম্ভাষণ, দর্শন পর্যন্ত নিষেধ। সন্ন্যাসী "স্ত্রী" শব্দও মুখে আনিবেন না, প্রকৃতি বলিবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে জীব সংসার দূরে রাখিয়া বিষয় ছাড়িয়া সাধন পথে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শুধু এক লক্ষ্য—এক উদ্দেশ্য। যিনি সন্ন্যাস লইতে পারিয়াছেন, তিনি তো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার আচরণ জীবের

আদর্শ। সন্ন্যাসীর কিঞ্চিন্মাত্র স্খলন হইলে ধর্মের ভাস্বর জ্যোতি যে মলিন হইয়া যাইবে। সন্ন্যাসী জগৎগুরু—তিনিই জীবকে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। প্রভু গৃহস্থাশ্রমী কোন ভক্তকে সন্ন্যাস লইতে বলিতেন না। "বৈষ্ণব-সেবা, নামসঙ্কীর্তন" এই তাঁহার অমূল্য উপদেশ। গৃহই তাহার উপযুক্ত স্থান।* মহাপ্রভুর অগণিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীবাসাদি গৃহী ভক্তের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণবকুলতিলক ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস যখন অতুল ঐশ্বর্য ও পিতামাতার স্নেহবন্ধন হইতে কিছুকালের জন্য মুক্ত হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে প্রভুর চরণতলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে জীবকে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥"

মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় "হরিদাস বর্জন" এক পুণ্য কাহিনী। তাহার গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অপারগ হইয়া অনেকে মহাপ্রভুর বিচারে কঠোরতা আরোপ করিয়া থাকেন। এই কাহিনী আরম্ভের পূর্বে তাই এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইল।

ছোট হরিদাস সংসারত্যাগী বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী। হরিদাস সুকণ্ঠ, তিনি নীলাচলে প্রভুসঙ্গে থাকিয়া সতত তাঁহাকে কীর্তন শুনাইতেন। বোধ হয় নামযজ্ঞের মহাসাধক মহাপ্রভুর পার্ষদ ও পরম প্রেমিক নীলাচলবাসী ঠাকুর হরিদাসের সহিত পৃথক বুঝাইবার জন্য এই আখ্যানোক্ত হরিদাস "ছোট হরিদাস" নামে পরিচিত ছিলেন।** ভগবান আচার্য নীলাচলবাসী প্রভুর

---

* ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) বলিতেন, (গৃহে থাকিয়া সাধন ভজন) "কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা।"

** কিন্তু "চরিতামৃতে" দেখিতে পাই, নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে দুই জন কীর্তনীয়া ছিলেন। প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বড় ও ছোট হরিদাস নাম হওয়া সম্ভবপর।

অন্যতম ভক্ত। তিনি এক দিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আচার্য ছোট হরিদাসকে মাধবী মাহিতীর নিকট হইতে প্রভুর ভিক্ষার জন্য কিছু উত্তম তণ্ডুল আনিতে বলেন। হরিদাস দ্বিধাবিহীনচিত্তে তণ্ডুল আনয়ন করেন। এই মাধবী মাহিতী গৌরগতপ্রাণা তপস্বিনীতুল্যা এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। প্রভুর সাড়ে তিনজন মরমী ভক্তের মধ্যে এই রমণী অন্যতমা। স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধজন গণনা করা হয়। প্রভু ভোজনে বসিয়া শাল্যন্ন দৃষ্টে আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত উত্তম তণ্ডুল কোথায় পাইলে ?" আচার্য বলিলেন, "মাধবী হইতে মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কে যাইয়া মাগিয়া আনিল" ? আচার্য নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—"ছোট হরিদাস।" প্রভু আর কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। অন্নের প্রশংসা করিয়া ভোজন সমাধা করিলেন। নিজগৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন—

"আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥"

আকস্মিক বজ্রপতনের ন্যায় মহাপ্রভুর আদেশবাণী হরিদাসের শিরে পতিত হইল। কি জন্য দ্বার মানা হইল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। হরিদাস নিজ জীবন পর্যালোচনা করিয়া কোন অপরাধের কার্য খুঁজিয়া পাইলেন না। মর্মান্তিক ক্লিষ্ট হইয়া তিনি আহার পরিত্যাগ করিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥

প্রভু উত্তরে বলিলেন—

"—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥"

আর একদিন সকল ভক্ত একত্রে প্রভু সকাশে আগমন করিয়া হরিদাসকে ক্ষমা করিতে কাতরে প্রার্থনা করিলেন।

"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিব অপরাধ॥"

কিন্তু যুগধর্ম-প্রবর্তক মহাপ্রভু নির্মম হইয়া উত্তর দিলেন—

"—কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

পরে বলিলেন—"তোমরা আর বৃথা কথা বলিও না, যদি আবার এ সম্বন্ধে কিছু বল, আমাকে আর নীলাচলে দেখিতে পাইবে না।" ভক্তগণ ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। হরিদাসের দণ্ডের ফলে ভক্তগণের ত্রাস উপস্থিত হইল।

"স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।"

চৈতন্যচরিতামৃত ঠিকই বলিতেছেন—

"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥"

হরিদাস প্রভু কর্তৃক বর্জিত হইয়া জীবন দুর্বিষহ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে যান, হরিদাস দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করেন। অনুতাপানল তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর অদর্শনজনিত বিচ্ছেদ অসহনীয় হইল। তিনি এক দিবস রাত্রি শেষে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেণীতে জাহ্নবী-নীরে দেহত্যাগ করিয়া হরিদাস অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইহার অনতিকাল পর একদিন প্রভু ভক্তগণসঙ্গে সমুদ্রস্নানে চলিয়াছেন, পথি-মধ্যে অশরীরী কণ্ঠে অতি সুমধুর কীর্তন শ্রবণে সকলে বিস্মিত হইলেন। হরিদাসের কণ্ঠস্বর সকলেরই সুপরিচিত। গোবিন্দাদি অনুমান করিলেন হরিদাস আত্মগ্লানিতে বিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছেন এবং অসৎযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিরালম্বে ভ্রমণ করিতেছেন। স্বরূপ বলিলেন, "ইহা তোমাদের মিথ্যা অনুমান।"

"আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥"

ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে কোন বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসেন এবং তিনি হরিদাসের গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগের বিবরণ সকলকে জানান। বর্ষান্তরে শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, হরিদাস কোথায়?" মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—"স্বকর্ম্ম-ফলভাক্ পুমান্।" শ্রীবাস তখন হরিদাসের সংকল্প, ত্রিবেণী প্রবেশ প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। প্রভু শুনিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

দেহত্যাগের পর হরিদাস জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম শরীরে যে মহাপ্রভুর নিত্যপর্ষদ-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার অশরীরী কণ্ঠের কীর্তন দ্বারাই ভক্তগণ সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এক দিবস প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে সুমধুর কণ্ঠে গীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া আবিষ্টচিত্তে গীত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হ'ন। কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষত হইল, কিন্তু প্রভু তন্ময় হইয়া ছুটিয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান নাই। আস্তে ব্যস্তে ভৃত্য গোবিন্দ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

"স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ লৈল কোলে ॥"

মহাপ্রভু তখন গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারিতেন, ত্রিভুবনের আর কেহ বলিতে পারিতেন না।

"প্রভু কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হৈত মরণ ॥"

এই মহাপ্রভুর ধর্ম। এই আদর্শ—এই শিক্ষা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ অধুনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে। সমাজের স্তরে স্তরে সে লীলার স্নিগ্ধধারা মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই প্রায় তুল্যরূপে অভিষিক্ত করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকও মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম ও শিক্ষার সম্মুখে আজ নতশীর্ষ। বিরুদ্ধবাদীর তীব্র সমালোচনা আজ মূক, যাঁহারা মহাপ্রভুকে অবতার স্বরূপ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন, তাঁহারও লীলার প্রতি পরম শ্রদ্ধাযুক্ত। অনেকেই এখন বুঝিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম ও তাহার অনুশীলনকারী ভোগলালসা-বর্জিত বৈরাগ্যপন্থাবলম্বী সর্বজনবরেণ্য উদাসী বৈষ্ণবের স্থান কত উচ্চে! বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ভোগবিলাসস্রোতে ভাসমান নিত্য যোষিৎসঙ্গী সমাজের নিম্নস্তরের যে নব-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগতপাবন সুমহান্ ধর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নির্লজ্জভাবে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সহজলব্ধ ভিক্ষান্নে জীবন বহন করিয়া থাকে, তাহারা মহাপ্রভুর ধর্ম বা শিক্ষার ফল নহে এবং কখনও হইতে পারে না।

১১

পূর্ব স্তবকে রূপ গোস্বামীর নীলাচলে আগমন এবং তৎকর্তৃক রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-নাটকের শ্লোকাদি শ্রবণে ভক্তগণের আনন্দানুভূতির বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যে বৃন্দাবন গমন করেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর নীলাচল ত্যাগ করিবার কিছুদিন পর তাঁহাব অগ্রজ সনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসেন। এই দুই ভ্রাতার জীবনীর সহিত গৌরলীলার বড ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রূপ-সনাতন গৌড়াধিপতি মুসলমান নরপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের তখন নাম ছিল—দবীব খাস ও সাকব মল্লিক। পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব হইয়াও ভাগ্যচক্রের অচিন্তনীয় ক্রুব আবর্তনে দুই ভ্রাতা মুসলমান নরপতির অধীনে কর্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধিবলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরূঢ হইয়া যোগ্যতার শেষ পুরস্কার স্বরূপ সর্বক্ষমতাপন্ন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। ইঁহারা সেকালে গৌড়দেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ঐশ্বর্যে অতুলনীয়, বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতায় দুই ভ্রাতার সমকক্ষ লোক তখন কেহ ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিধর্মী রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও পার্ষদ থাকায় সৎ ব্রাহ্মণ হইয়াও হিন্দুধর্মবিগর্হিত নানা দূষনীয় কার্যই ইঁহাদিগকে অনুমোদন করিতে হইত। মুসলমান নরপতি নামে মাত্র রাজা ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন দুই ভ্রাতা। ইঁহাদিগের উভয়ের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার বিধর্মীর ন্যায়ই ছিল। কিন্তু বাহ্যিক কঠোর আবরণের অন্তঃস্থলে তাঁহাদের যে সরস হৃদয় ছিল, তাহার কমনীয়তা সকলকে মুগ্ধ করিত। কর্মবিপাকে স্ব স্ব ধর্মাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় রূপ-সনাতন সর্বদা মর্মাহত থাকিতেন। হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে তীব্র বৈরাগ্যের এক সুপরিস্ফুট ভাব উত্থিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রতি কার্যে প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহারা গৌড়দেশের সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, তাঁহার অপার্থিব প্রেম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব ভারতী যখন সর্বজনবিশ্রুত হইয়া পড়িল, রূপ-সনাতন দূর হইতে তখনই প্রভুর চরণে জীবন বিকাইয়া দিয়াছিলেন। যদিও তখন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার

সুযোগ হয় নাই, কিন্তু স্বাভাবিক সরল বিশ্বাসাধিক্যে দূর হইতে মহাপ্রভুকে স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে নিজকৃত অপরাধ ক্ষালনের জন্য মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিকট দৈন্যপত্রী প্রেরণ করিতেন। মহাপ্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে ইঁহাদের মনে কখনও কোন প্রকার দ্বিধা বা সংশয়ের ছায়া পড়ে নাই। তাঁহাদের নির্মল হৃদয়াকাশে তীব্র বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে কোন সংশয়-মেঘ সঞ্চিতই হইতে পারে নাই। মহাপ্রভুর স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্বদা হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। মহাপ্রভুকে এমন করিয়া দ্বিধাবিহীন চিত্তে প্রথমাবধি পরিপূর্ণভাবে আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রভু পূর্বাবধি দুই ভ্রাতার অশেষ সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার ব্যর্থ উদ্যমে প্রভু ভ্রাতৃদ্বয়েব জন্মভূমি "কানাই নাটশালা" গ্রামে উপস্থিত হইলে, রূপ-সনাতন গভীর রজনীতে অতি দীন বৈষ্ণববেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রভু তাঁহাদের দৈন্য কাতরোক্তিতে বিচলিত হইলেন। সে দৈন্যোক্তিতে পাষাণ গলিয়া যায়—

"পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর॥

* * * *

ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত-পাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়ে যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঁও ক্ষোভ।
তবু তোমার গুণে প্রভু, উপাজয়ে লোভ॥"

প্রভু উভয়কে মহা কৃপা করিলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর। আজ হইতে তোমাদের নাম হইল—শ্রীরূপ, সনাতন। তোমরা গৃহে গমন কর, অচিরাতে কৃষ্ণ তোমাদিগকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিবেন।"

বৈষ্ণবজগতে রূপ-সনাতন সর্বজন-বরেণ্য সর্বজন-আদৃত নাম। মহাপ্রভুর

নবধর্ম প্রচারের প্রধানতম সহায় রূপ-সনাতন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ বৈষ্ণবধর্মালম্বীর সম্মুখে সর্বদা প্রতিভাত রাখিয়া প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া ইঁহারা বৃন্দাবনে প্রেমময় জীবন বহন করেন। অপ্রমেয় ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার অভ্রভেদী উচ্চ শীর্ষ হইতে দীনাতিদীন অনাসক্ত বৈষ্ণবের পবিত্র জীবন বহন-প্রণালী ইঁহারাই সর্বপ্রথম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দুই ভ্রাতা বৃন্দাবনে কেমন জীবন বহন করিতেন, তাহা নিম্নে কয়েকটি শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে—

"অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্তন-প্রেমে নহে সেহ দিনে॥
কভু রসশাস্ত্র করয়ে ভক্তি লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥"

রূপ গোস্বামীর নীলাচল ত্যাগের অব্যবহিত পরেই সনাতন ঝাড়িখণ্ডের নিবিড় অরণ্য-পথ দিয়া একাকী নীলাচলে আগমন করেন। ঝাড়িখণ্ডের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং দীর্ঘকাল অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক ক্লেশে তাঁহার দুরারোগ্য গাত্র-কণ্ডুয়ন রোগের সৃষ্টি হয় এবং অল্পকাল মধ্যে এই রোগ সর্ব শরীর আচ্ছন্ন করে। সর্ব শরীরব্যাপী কণ্ডুয়ন হইতে নিয়ত ক্লেদ, রক্ত প্রভৃতি নির্গত হইত। সনাতন তখন প্রকৃত বৈরাগী—দেহের প্রতি আর মায়া নাই, বিশেষতঃ গাত্র কণ্ডুয়নের ক্লেদাদিযুক্ত দেহ তিনি অপবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ঝাড়িখণ্ডের পথে চলিতে চলিতে তাঁহার গভীর নির্বেদ উপস্থিত হইল। সনাতন বিচার করিতে লাগিলেন—আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে পারিব না, মহাপ্রভুর দর্শন লাভ বোধ হয় আমার ভাগ্যে নাই। বিধর্মীর সংস্পর্শে আমার দেহ মন কলুষিত হইয়াছে। যদি কোন জগন্নাথসেবক অনবধানতায় আমাকে কখনও স্পর্শ করেন, তাহাতে আমার গুরুতর অপরাধ হইবে। সুতরাং এমন গ্লানিজনক ঘৃণ্য জীবন বহন করা অপেক্ষা দেহত্যাগ করাই আমার পরম শুভপ্রদ। মহাতীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, মহোদধি-তীরে রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে রথচক্রের নিম্নে এই ব্যর্থ দেহ রক্ষা করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন এবং রূপ গোস্বামীর ন্যায় তিনিও হরিদাস ঠাকুরের অতিথি হইলেন। কিন্তু স্বীয় নির্মম সংকল্পের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না, তাহা প্রকাশ করিবার বিষয়ও নহে। মহাপ্রভু নিত্য সমুদ্রস্নান-পথে হরিদাসকে দেখা দিয়া যাইতেন। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু একদিন হরিদাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইলে হরিদাস বলিলেন—

"প্রভু, সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে।"

প্রভু উৎফুল্ল হইয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন. সনাতন বিদ্যুৎগতিতে পশ্চাৎ হটিয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥"

সনাতনের এই যে দৈন্যোক্তি—তাহা শুধু মৌখিক নহে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, বিধর্মী সংস্পর্শে তাঁহার প্রকৃতই পতন হইয়াছে। ব্রহ্মণ্যগৌরব—হিন্দুর পবিত্র ধর্ম তাঁহাতে আর নাই। কিন্তু প্রভু কোন কথা শুনিলেন না, বলপূর্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, আর সনাতনের রোগক্লিষ্ট দেহের ক্লেদাদি প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিল।

সনাতনের পরিচয় জানিয়া সকল ভক্তগণই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এক দিবস প্রভু সনাতনকে বললেন—"তুমি নীলাচলে আসিয়া ভাল করিয়াছ, হরিদাস সহ বাস করিয়া সতত কৃষ্ণনাম আস্বাদন কর।" অপর এক দিবস প্রভু হরিদাস ও সনাতন সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং আচম্বিতে বলিলেন—

"সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥

"দেহত্যাগে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না সনাতন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণভজন। ভক্তি ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য কোন পন্থা নাই। দেহত্যাগের সংকল্প তমগুণপ্রসূত। তমগুণের প্রাবল্যে পাতক হয়। এসব কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্তন কর। অচিরে দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণভজনে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ নাই।"

"নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

সনাতন বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণের সযত্নরক্ষিত গূঢ় সংকল্পটি প্রভু যে এমন করিয়া সবজন সমক্ষে বাহিরে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে তীব্র কশাঘাতে মৃতকল্প করিয়া তুলিবেন, সনাতন তাহা ধারণাই করিতে পারেন নাই। তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

"সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥
নীচ পামর মুঞি পবম স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥"

উত্তবে প্রভু বলিলেন—"তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, দেহে তোমার আর অধিকাব নাই, তাহা আমার নিজ ধন। তোমাব দেহ দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব।"

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন কবিয়া প্রভু স্বীয় গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ করিলেন।

"ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আব বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥"

প্রভু হরিদাসকে বলিলেন—"হরিদাস, এমন অন্যায় কার্য হইতে সনাতনকে বিরত করিও।" সনাতন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু সনাতনের দেহ নিজ সম্পত্তি বলিলেন, এতদপেক্ষা গৌরব ও সৌভাগ্য

জীবের আর কি হইতে পারে? হরিদাস আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "সনাতন, তুমিই ধন্য! তোমার দ্বারা প্রভু তাঁহার নবধর্ম প্রচার করিবেন, ভাগ্যহীন আমি—

ভারতভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল"।

বৈষ্ণবকুলতিলক—দীনতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি—ঠাকুর হরিদাসের উপযুক্ত কথাই বটে! যিনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে নিত্য নীলাচলধামে বাস করিয়া প্রতি দিবস তিন লক্ষ নাম কীর্তন দ্বারা মোহান্ধকারে বিচরণশীল বিমূঢ় জীবকে সাধনার সুদীপ্ত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রবর্তিত নবধর্মের একনিষ্ঠ সেবক, নাম-যজ্ঞের সবপ্রধান অগ্নিহোত্রী—মহাপ্রভু যাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে",

স্বয়ং মায়াদেবী ভুবনমোহিনী বেশে প্রলোভন দিতে গিয়া যাঁহার অটল সুমেরুবৎ দৃঢ় সংকল্পের সম্মুখে হৃতগর্ব ও সম্ভ্রমে নতশীর্ষ হইয়া একদিন যাঁহাকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একালা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥"

মহাপ্রভুর যুগধর্ম প্রচারের সর্বোত্তম সহচর মহাপ্রেমিক ঠাকুর হরিদাস বলিতেছেন—

"ভারতভূমেতে জন্মি দেহ ব্যর্থ হৈল।"

এই দৈন্য—"অহংজ্ঞানের" এই সর্বতোভাবে বিলোপসাধন বৈষ্ণব ধর্মের নিজস্ব। এই ধর্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অতঃপর সনাতন দেহত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করতঃ হরিদাস সহ সানন্দে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন।

রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন হইলে তাঁহাদের সহিত সনাতনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। মহাপ্রভুর প্রতি সনাতনের হৃদ্‌গত ভাব পরীক্ষার জন্য এক দিবস প্রভু সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটা হইতে মধ্যাহ্নকালে সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রখর সৌরকরে সমুদ্রতটের বালুকণা জলন্ত অগ্নিকণায় পরিণত হইয়াছে। রক্তমাংস দেহধারীর পক্ষে সে জলন্ত বালুতট দিয়া নগ্নপদে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রভু ডাকিয়াছেন—এই আনন্দে সনাতন বিহ্বল—তাঁহার বাহ্যজ্ঞানই প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

সনাতন সেই প্রখর সৌরকরদীপ্ত জলন্ত বালুতট দিয়া নগ্নপদে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন—পদদ্বয় পুড়িয়া গেল—কিন্তু সনাতনের হৃদয়, মন তখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে, তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই নাই। প্রভু মধ্যাহ্ন ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, সনাতন উপস্থিত হইবামাত্র গোবিন্দ তাঁহাকে ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রদান করিল। সনাতন প্রভুসকাশে দণ্ডবৎ হইলে স্মিতমুখে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন পথে আসিলে ?" সনাতন বলিলেন—"সমুদ্র পথে।" বিস্মিত হইয়া প্রভু বলিলেন—

"তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন না আইলা।"

উত্তরে সনাতন যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় গৌর-ভক্তেরই শোভনীয়।

"সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল॥"

এই রাগভক্তি—ইহার অঙ্কুরমাত্র জন্মিলেই জীবের ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের আর অধিক বিলম্ব থাকে না। উত্তর শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন দিলেন।

মহাপ্রভু প্রায়ই সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন। পুনঃ পুনঃ বাধা সত্বেও সনাতন মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। সনাতনের সর্ব শরীর গাত্রকণ্ডূয়নে আচ্ছন্ন, তাহা হইতে সর্বদা ক্লেদাদি নির্গত হইত। আলিঙ্গন কালে ঐ ক্লেদাদি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিত। সনাতন ইহাতে নিতান্ত মর্মাহত হইতেন, কিন্তু উপায় নাই। সনাতন এক দিবস নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে প্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দকে স্বীয় দুঃখবারতা জ্ঞাপন করিলেন এবং উপস্থিত স্থলে তাঁহার কি কর্তব্য জানিতে চাহিলেন। সনাতনের কণ্ডূরসযুক্ত মলিন দেহ যে প্রভু পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন, ইহাতে পণ্ডিত এবং নীলাচলবাসী প্রভুর অগণ্য ভক্তমণ্ডলী নিতান্ত ব্যথিত থাকিতেন। মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর এই কার্য সকলের অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইত। প্রভুর দেবশরীরে সে অপবিত্র কণ্ডূরস স্পর্শ করে, ইহা ভক্তগণের অসহনীয়। তাই সনাতন যখন পণ্ডিত জগদানন্দকে নিজ কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বিলক্ষণ সরল ভাবেই বলিলেন—

"তোমার এখন বৃন্দাবন গিয়া বাস করাই সঙ্গত। যে কার্যে আসিয়াছিলে, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে—প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছ। রথযাত্রা দেখিয়া এখন

বৃন্দাবন গমন কর।" সনাতন এই পরামর্শই উত্তম জ্ঞানে শিরোধার্য করিলেন।

"তাঁহা যাব সেই মম প্রভুদত্ত দেশ।"

আর এক দিবস প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলে, সনাতন সত্রাসে পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন—কিন্তু প্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বিষাদখিন্ন কণ্ঠে সনাতন বলিলেন—

"প্রভু, আমি দুষ্ট, পাপাশয়—তুমি আমাকে স্পর্শ করিলেও আমার অপরাধ হয়, তাহাতে আমার দেহ কণ্ডূরসে আচ্ছন্ন—আলিঙ্গন কালে তোমার শ্রীঅঙ্গে এই ক্লেদ স্পর্শ করে। বীভৎস স্পর্শ করিতে তোমার ঘৃণা হয় না—তুমি ঘৃণা, বীভৎসের পার। কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হইবে। এখানে থাকিলে আমার কল্যাণ নাই, আজ্ঞা দাও আমি বৃন্দাবন যাত্রা করি।"

উত্তরে প্রভু সস্নেহে বলিলেন—তোমার দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু আমার নিকট তাহা অমৃতোপম। তোমার দেহ প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত। আমি সন্ন্যাসী—সমদৃষ্টি, চন্দন ও পঙ্কে তুল্য জ্ঞান করাই আমার ধর্ম। আমি তোমাকে লাল্য ও নিজকে লালক জ্ঞান করি। মাতা যেমন পুত্রের অমেধ্য গায়ে লাগিলে তাহাতে ঘৃণাবোধ না করিয়া মহা সুখ বোধ করেন, আমিও তোমার গাত্রস্পর্শে তদ্রূপ সুখানুভব করি, তোমার দেহে কণ্ডূ উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই বিধান। আমার পরীক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা।* যদি আমি তোমার কণ্ডূক্লিষ্ট দেহ ঘৃণাভরে আলিঙ্গন না করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম। এ বৎসর তুমি আমার সঙ্গে নীলাচলে বাস কর, আগামী বৎসর তোমাকে বৃন্দাবন পাঠাইব। বলিতে বলিতে প্রভু পুনবার সনাতনকে সপ্রেম আলিঙ্গন দিলেন, আর—

"কণ্ডূ গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।"

রোগদুষ্ট বা বিকলাঙ্গ দেহ প্রভু-আলিঙ্গনে স্বাভাবিক পূর্ব সৌন্দর্য লাভ করার উদাহরণ এই প্রথম নহে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কুষ্ঠরোগক্লিষ্ট

---

* সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূ উপজাঞা।
আমা পরীক্ষেতে ইহা দিল পাঠাইয়া॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে॥

দ্বিজোত্তম বাসুদেব ঠাকুর প্রভু-আলিঙ্গনে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে সহসা মুক্তিলাভ করিয়া সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর লীলা আলোচনায় আমরা এ পর্যন্ত প্রভুর বিশেষ কোন অলৌকিক কার্যের উল্লেখ করি নাই। কোন অলৌকিক কার্যের সমালোচনা দ্বারা মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করার আমরা আদৌ অভিলাষী নহি। যাহা সাধারণ মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অনধিগম্য, যাহা প্রাকৃত জীব তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত বলিয়া ধাবণা করিবেন—তাহার উল্লেখ দ্বারা মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রমাণেব চেষ্টা করিলে, অবিশ্বাসের ছায়া ঘনীভূত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া বিচিত্র নহে।

অলৌকিক কার্যের সমালোচনা চলে না। এই কার্যের অনুষ্ঠানকারীকে প্রথম হইতেই সাধারণ মানবের স্তর হইতে উচ্চে স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইতে হয়। যাঁহাদের বিশ্বাস কোমল অথবা সুনিয়ন্ত্রিত যুক্তি ও হেতুমূলক, তাঁহারা কোন অলৌকিক কার্যের সাববত্তা সহজে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে দোষ দেওয়া যায় না। যে কার্য আমাদেব সহজ জ্ঞান-বুদ্ধিব তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা কঠিন, চরিতাখ্যায়িকায় তাহার যত স্বল্প উল্লেখ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। "নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে" আমরা পাঠককে দেখাইতে চাই—মহাপ্রভুব কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত কার্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও, কেবল তাঁহার দৈনন্দিন কার্যগুলি বিশদরূপে পর্যবেক্ষণ করিলেই তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতার ব্যতীত সাধারণ জীব সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সনাতনের দেহ রোগমুক্ত কবা অথবা বাসুদেব ঠাকুরের কুষ্ঠরোগদুষ্ট দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রদান করার বিবরণ যদি পাঠক বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন, বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমন্মাপ্রভুর ভগবত্তা এত শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অলৌকিক কার্য বা ঐশ্বর্য প্রকাশ এই লীলার অতি গৌণ কর্ম। তাহা লীলা হইতে বাদ দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। যোগপথে আরোহণশীল যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি বিভূতি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা অতি সহজসাধ্য। বস্তুতঃ যোগপথে অগ্রসর হইলে এই সমস্ত বিভূতি সাধনার অন্তরায়স্বরূপ স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

সনাতন প্রভু-আদেশে আরও এক বৎসর নীলাচলে অপেক্ষা করিয়া দোলযাত্রা অন্তে বৃন্দাবন প্রস্থান করিলেন—

"যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥"

প্রভু যে পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, সনাতন বলভদ্র ভট্টাচার্যের নিকট তাহা সবিস্তারে লিখিয়া লইলেন।

প্রভু পথে পথে যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দর্শনে সনাতন প্রেমাবিষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পর রূপ আসিয়া মিলিত হন। দুই ভ্রাতা তদবধি বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন।

"দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা প্রকাশ করিলা ॥"

১২

মহাপ্রভুর লীলার সহচররূপে যে কয়েকটি প্রেমিক ভক্তের এই কালে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদেব অনেকেরই অল্পাধিক বিবরণ পূর্ব পূর্ব স্তবকে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রভু যে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাব অন্যতম মূলসূত্র একদিন সনাতনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥"

যিনি ভগবান ভজন করিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।" এই সূত্র জীবহৃদয়ে সর্বদা জাগরূক রাখিবার জন্য মহাপ্রভুর লীলার স্থানে স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, এই লীলায় রায় রামানন্দের স্থান কত উচ্চে—অথচ তিনি শূদ্র, বাহ্যিক ব্যবহারও বিষয়ীর ন্যায়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরসবেত্তা এমন মহাপ্রেমিক সেকালেও বিরল ছিলেন। মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে সর্ব প্রথম তাঁহার দ্বারাই ভক্তি ও সাধন-রহস্য প্রচার করেন। স্বয়ং প্রশ্নকর্তা হইয়া (বা সাজিয়া) রামানন্দের দ্বারা ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বনিচয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। রামানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তখন বলিয়াছিলেন—

"—আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমতে নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার সনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি॥"

ঠাকুর হরিদাস যবন-বংশোদ্ভব। তাঁহার দ্বারা প্রভু নাম-মহিমা প্রচার করেন। আভিজাত্য-গৌরব সাধনার অন্তরায়। "অহং"-ভাব হৃদয় হইতে মছিয়া না গেলে—আপনাকে লঘু মনে করিয়া দীন না হইলে, ভজনে নিষ্ঠা আসিতে পারে না। এই জন্যই আভিজাত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া যাহাতে জীব প্রকৃত ধর্মের আস্বাদ পাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভুর লীলায় বিরল নহে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র সজ্জন, বিষয়ত্যাগী, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণের তলদেশ হইতে একটু অভিমান, একটু গর্ব সময় সময় উত্থিত হইয়া তাঁহার স্বচ্ছদৃষ্টি কুয়াসাচ্ছন্ন করিত। এই অভিমানটুকু থাকিলে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না।

মিশ্র-ঠাকুর হয়ত মনে করিতেন, ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া ভগবৎ ভজনে তাঁহার কিছু বেশী দাবী আছে। ব্রাহ্মণেতর কোন বিষয়ী হইতে যে ভজন-রহস্য বা সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিতে পারা যায়, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। এক বিদস তিনি প্রভুর নিকট আসিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রভু অন্তর্যামী। মিশ্রের মনের গূঢ় ভাব তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। তিনি মিশ্রকে বলিলেন, "কৃষ্ণকথা আমি ত কিছু জানি না। কৃষ্ণকথা কেবল রায় রামানন্দ জানে, আমি তাহার নিকট শুনিয়া থাকি, তোমার বড় ভাগ্য, কৃষ্ণকথায় রুচি হইয়াছে। তুমি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।"

প্রভু কি উদ্দেশ্যে মিশ্রকে রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন, মিশ্র তাহা ধরিতে পারিলেন না।

প্রভুর আদেশে তিনি রয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। রায়ের সেবক তাঁহাকে জানাইলেন, রায় রামানন্দ তৎকালে পরমা সুন্দরী কিশোরী, নৃত্যগীতসুনিপুণা দুই দেবকন্যাকে নিভৃত উদ্যানে নিজকৃত নাটকের গীত ও নর্তন শিক্ষা দিতেছেন। তিনি আরও শুনিলেন—

"রামানন্দ রায় সেই দুইজন লইয়া।
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন॥
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্জ্জন।
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন॥"

শূদ্র বিষয়ী বলিয়া প্রথম হইতে রায়ের প্রতি মিশ্রের তেমন শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। সেবকমুখে কিশোর বয়স্কা সুন্দরী দেবদাসীগণের প্রসাধনের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাব মনে এক দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। রূপলাবণ্যসম্পন্না নারী সহ নির্জনে অবস্থান এবং তাহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দেওয়া! এ আবার কি প্রকার ভজন। মিশ্রের অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অথচ প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকেন। মিশ্র কিছু বুঝিতে না পারিয়া নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রায়ের ভজন বৈষ্ণবধর্মের চরমোৎকর্ষ গোপী-অনুগা মধুর ভজন। বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ পবিণতি এই ভজনে। প্রাকৃত জীব সে ভজনেব অধিকারী নহে। প্রত্যুত তাহার রহস্য ধারণা করাও সাধাবণ জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দেহজ্ঞান থাকিতে মধুর বা কান্ত ভজনে কেহ অধিকাবী হইতে পাবেন না। স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞানেব সম্যক্ বিলোপ না হইলে মধুব ভজনেব অধিকার জন্মিতেই পারে না। বায়ের নিকট সুন্দরী নারীও পাষাণ-প্রতিমা তুল্য। তিনি গীতার গূঢ় অর্থ দেবকন্যা দ্বারা অভিনয় করাইয়া তাহাব আনন্দ রস আস্বাদ করিতেন—

"সঞ্চাবী সাত্ত্বিক স্থাযী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকট লাস্য বায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥"

রায়ের নিজকৃত যে গান গাহিতে আরম্ভ করায় প্রভু প্রেমে স্বহস্তে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বামানন্দেব ভজন-প্রণালী কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে।

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥"

এই প্রেমের খেলা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দুর্লভ সম্পদ। মিশ্র-ঠাকুর তাহার

কি বুঝিবেন। রায়ের সেবক মিশ্র ঠাকুরের আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলে কিছুক্ষণের মধ্যে রায় সভায় আসিলেন এবং মিশ্রকে সসম্মান নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু মিশ্রের মনের ভাব সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আর উন্মুখ নহেন, তাই আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া কেবল বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" বেলা অধিক হওয়ায় মিশ্র গৃহে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে?" মিশ্র তখন আর মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, অকপটে তাহা নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া আবেগভবে বলিলেন—

"রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥
* * * *
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহাব॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

মহাপ্রভু রায় সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন, তাহা কি সাধারণ জীব ধারণা করিতে পারেন? "অপ্রাকৃত দেহ" জিনিসটা কি, তাহাই তো ধারণা হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃত তাই বলিতেছেন—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম সীমা॥"

মিশ্র প্রভুর কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তাঁহার সংশয়ের কথা মনে উদিত হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমিই রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥"

লজ্জিত অনুতাপদগ্ধ মিশ্র ত্বরিত পদে পুনরায় রায় সমীপে উপস্থিত হইয়া

কৃষ্ণ কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মিশ্রকে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া সহর্ষে রায় বলিলেন—"ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা।" কৃষ্ণকথা আরম্ভ হইল। সে পুণ্য কথার স্নিগ্ধ হিল্লোলে বক্তা শ্রোতা উভয়েই স্নাত হইলেন। ক্রমে রসামৃতসিন্ধু উত্থিত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত উভয়ে তন্ময়চিত্ত। দিবা অবসানে রায় বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। মিশ্র একেবারে অভিভূত হইয়াছেন। বিদায়কালে গদগদ্ কণ্ঠে রায়কে বলিলেন, "আজ কৃতার্থ হইলাম।" সন্ধ্যা সমাগমে মিশ্র প্রভু-চরণে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিলেন—

"প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহনে না যায়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি-রসময়॥"

—বলিতে বলিতে সরল মিশ্র ঠাকুর হঠাৎ আসল কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। "প্রভু, রায় আর একটা কথা আমাকে বলিলেন—

"কৃষ্ণ কথা বক্তা করি না জানিহ মোরে।
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা-যন্ত্র॥"

প্রভু তোমার এত কৃপা, ব্রহ্মাদির দুর্লভ ধন আমাকে দান করিয়াছ।" প্রভু উত্তরে বলিলেন—

"—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়॥"

এই তো প্রভুর লীলার ভঙ্গী। যে সূত্রটি আমরা প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি, রায় রামানন্দ কর্তৃক কৃষ্ণকথা আলাপনে, ব্রহ্মণ্য-গৌরবে আত্মপ্রবঞ্চিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আমূল পরিবর্তনে সেই সূত্রই ব্যাখ্যাত হইল। বল্লভ ভট্টের প্রতি প্রভুর ব্যবহার দ্বারাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়, আভিজাত্য-গৌরবজনিত মানবের হৃদ্গত অভিমান প্রভু ভক্তিপথের কত বড় বিঘ্ন জ্ঞান করিতেন। বল্লভ ভট্ট নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রভাবে তিনি আত্মাভিমানী, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান। মহাপ্রভুর প্রতি ভট্টের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। বৃন্দাবন ভ্রমণকালে তিনি প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া বিধিমত সেবা করিয়া-

ছিলেন, স্বয়ং প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই জল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপে প্রভুর মহাপূজা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে বল্লভ ভট্ট একদিন তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমাকে দেখিবার জন্য বহুদিন হইতে মনের বাসনা, জগন্নাথকৃপায় তাহা পূর্ণ হইল। তোমাকে যে স্মরণ করে, সেই পবিত্র হয় আর দর্শনের তো কথাই নাই। কলিকালে প্রভুনাম-কীর্তনই যুগধর্ম—তুমি তাহা প্রচার করিয়াছ। কাজেই তুমি যে প্রভুশক্তিধর, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।" ভট্ট মহাপ্রভুকে পূর্ণ বিশ্বাসে ভগবান জ্ঞান করিতে পারিতেছেন না—ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ যে তাহার মধ্যে হইয়াছে—তিনি ভগবানের শক্তি ধারণ করেন, এই পর্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে ভট্টের মনে যে ভাবই থাকুক, তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের প্রতি ভট্টের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

স্থূল কথা, ভট্ট এত দিবস বাসুদেব সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যজীবনের মত কেবল শাস্ত্রালোচনায় ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যেই জীবন বহন করিয়াছেন। ভক্তি কি, তাহা জানেনও না এবং তাহা লাভ করিবার কোন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। পাঠক দেখিতেছেন, ভট্টের জীবনের এই অংশ সার্বভৌমেরই অনুরূপ। প্রভু ভট্টের মনোভাব সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাই উত্তরে বলিলেন, "দেখ ভট্ট, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্তির আমি কিছুই জানি না। অদ্বৈত আচার্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সঙ্গলাভে আমার মন নির্মল হইয়াছে। আচার্যের ন্যায় কৃষ্ণভক্ত আর নাই। নিত্যানন্দ প্রেমের সাগর, সর্বদা ভাবোন্মত্ত। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ষড়দর্শনে জগৎ-গুরু। তাহারা আমাকে ভক্তিযোগের পার দেখাইয়াছেন। রায় রামানন্দ কৃষ্ণরসনিধান, ঐশ্বর্যজ্ঞানে যে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না—তাঁহাকে পাইতে হইলে যে রাগমার্গে ভজন আবশ্যক—দাস্য, সখ্য প্রভৃতি কোন এক ভাব আশ্রয় করার প্রয়োজন—এই সব গূঢ়তত্ত্ব আমি রায় হইতে শিখিয়াছি। স্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি সকলেই মহা ভাগবতোত্তম, নাম-মহিমা কৃষ্ণভক্তি আমি এই সব ভক্ত সঙ্গেই লাভ করিয়াছি। এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তগণের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টের মনের অভিমান, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত যাহা কিছু তাহা কেবল তাঁহারই বিদিত, ভাগবতের অর্থ তিনিই কেবল ব্যাখ্যায় পটু। এই অভিমানে আঘাত দিয়া তাহার উচ্চ চূড়া ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভু স্বীয় ভক্তগণের গুণকীর্তন করিলেন। ভক্তগণের সহ ভট্টের সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভুর ভক্তগণের যে তেজ, যে প্রেম দর্শনে মহারাজা

প্রতাপরুদ্র, বিজ্ঞশিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌম বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়া নির্নিমেষ-লোচনে নীলাচল প্রবেশ দ্বারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, ভট্ট যে সে তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণবমূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁহাদের সম্মুখে ভট্ট খদ্যোতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। রথযাত্রা তিথিতে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর নর্তন কীর্তন দর্শনে ভট্ট অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভট্ট নিজেও একজন ভাগবত-শাস্ত্র চর্চায় কাল কাটাইলেও ভগবৎ নাম-কীর্তনের আনন্দ তাহাকে যে স্পর্শ না করিল, তাহা নহে। কিন্তু অভিমান সহজে দূরীভূত হয় না। মানুষ যখন এই বৈরীর প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত, তখনও ইহা পূর্ণাবয়ব লাভ করিবার জন্য সময়েব প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভট্ট পণ্ডিত লোক, মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত - নীলাচলে ভক্তগণের সহিত নিত্য সংসর্গে আনন্দও লাভ কবিতেছেন—কিন্তু তথাপি স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে সর্বদাই লোলুপ।

তাঁহার বিদ্যাভিমান নমিত হইতেছে না। ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ দ্বারা প্রকৃতই দীনতার সৃষ্টি না হইলে এই অভিমান সমূলে ধ্বংস হইতে পাবে না। ভট্ট একদিন প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, আমি ভাগবতেব টীকা কিছু করিয়াছি। কৃপা করিয়া শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হই।" উত্তরে প্রভু বলিলেন—

"ভাগবতের অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী।"
কৃষ্ণ নাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥

ভট্টের মনের গর্বিত ভাব প্রভুর অবিদিত ছিল না। তিনি যে কেবল পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণ বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই ভাগবতেব টীকা করিয়াছেন, প্রভু তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। কাজেই ভট্টর সে নীরস ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে কিছু মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ভাগবত প্রেমময়। প্রেমিক ভিন্ন তাহাব সঠিক ব্যাখ্যা কেহ করিতে পারেন না। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় তাহার শ্লোকের বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার রস আস্বাদন হইতে পারে না। নিজে আস্বাদ না করিলে অপরকে তাহার আস্বাদ প্রদানের চেষ্টাও বিডম্বনা মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীমুখে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠক ও শ্রোতার উভয়েরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাত্রার দ্বিতীয় উদ্যমে জননী ও ভাগীরথী দেখিবার জন্য প্রভু নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কিবা বাখানিমু পড়াইমু বা কেমনে।
ইহা প্রভু আজ্ঞা মোরে কহিবা আপনে॥"

প্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥"
আদ্য মধ্য অন্তে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য সিদ্ধ, অক্ষয় অব্যয়॥
প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ॥
*　　*　　*
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি অমৃত সভারে বুঝাইয়া॥

(চৈতন্য ভাগবত)

এইত প্রভুর উপদেশ! ভক্তিবিমুখ ভট্টকৃত টীকায় ভাগবতের যে প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে না—তিনি যে তাহার গূঢ় মর্ম ধারণা করিতে পারেন নাই, তাহা প্রভু পূর্ব হইতেই জানিতেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেও ভট্টের চৈতন্য হইল না। অভিমানের মূলোচ্ছেদ হওয়া বড় কঠিন। আর একদিন ভট্ট বলিলেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা করিয়াছি, শ্রবণ করুন।" প্রভু স্থিরকণ্ঠে বলিলেন—

"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি॥"

ক্রমাগত অনাদৃত হওয়ায় ভট্ট সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। ভট্ট যে সিদ্ধান্ত করেন, আচার্যাদি ভক্তগণ তাহা সহজেই খণ্ডন করিয়া স্ব স্ব মত প্রবল করেন।

ভট্টের ব্যাখ্যা যে কেবল নীরস, তাহা নহে, তাহা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। গভীর তত্ত্বের মধ্যে তিনি ত প্রবেশই করিতে পারিতেন না, বাহ্যিক অর্থাদিরও মর্ম গ্রহণে অপারগ ছিলেন। তাহার প্রশ্নাদি কত অসার ও বালকোচিত, তাহার সামান্য একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। এক দিবস তিনি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সমস্ত জীবই প্রকৃতি—শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি। তিনি একমাত্র পুরুষ।

তোমরা সকলেই প্রকৃতি-স্থানীয়। পতিব্রতা নারী কখনও স্বামীর নাম মুখে আনেন না। তোমরা যে নিয়ত কৃষ্ণ নাম লও, এ তোমাদের কোন্ ধর্ম ?”

এরূপ প্রশ্ন বালকের পক্ষেই শোভা পায়। ভট্টের ব্যাখ্যাদি কত অপকৃষ্ট দরের, তাহা এতদ্বারা স্থচিত হইতেছে। প্রভু উত্তরে বলিলেন—

পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥”

ভট্ট নির্বাক্। তিনি গৃগে ফিরিয়া নিজ অবস্থার আলোচনা করিয়া বড় বিমর্ষ হইলেন। মহাপ্রভুর সভায় সবভক্ত সমক্ষে প্রতিদিন যে তিনি অপদস্ত হইতেছেন—তাঁহার মান, যশ, সম্ভ্রম যে লুপ্তপ্রায়, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কি উপায়ে এই বিনষ্টপ্রায় সম্মান রক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য ভট্ট চঞ্চল হইলেন। কিন্তু কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। এই অবস্থায় আর এক দিবস ভট্ট নিজ জন পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুর সভায় উপস্থিত হইয়া সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—

“ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
সহিতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন ॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে জানি।
এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি ॥”

জগৎগুরু শ্রীধর স্বামীকে মানি না— তাঁহার বাক্য খণ্ডন করিয়াছি, এত বড দম্ভ ও সাহসের কথা বৈষ্ণবের অসহ্য। ভট্ট স্ফীতবক্ষে কথাটা বলিলেন। মৃদু হাসিয়া প্রভু উত্তর করিলেন—

“* * স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥”

যেমন কথা, উত্তরও তদ্রূপ। উত্তরের তীক্ষ্ণতা ভট্টের হৃদয় বিদ্ধ করিল। আজ ভট্ট বড় অপমানিত, বড় লাঞ্ছিত হইয়া ম্রিয়মান হইলেন। আজ তাঁহার অভিমান গৌরব কক্ষচ্যুত দুষ্ট গ্রহের ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইল—আজ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বে প্রয়াগে প্রভু আমাকে মহাকৃপা করিয়াছিলেন, স্বগণ সহিত আমার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন—আর এখন প্রতিদিন আমার প্রতি এ ব্যবহার

কেন? প্রভুর মন কেন বিরূপ হইল? আমিই অপরাধী। আমিই উৎকট অভিমানে অন্ধ। আমি জয়লাভ করি, কেবল এই গর্বে আমার অন্তকরণ পূর্ণ। প্রভু স্বয়ং ভগবান। আমাকে গর্বশূন্য করিবার জন্যই করুণাময় প্রভুর এই মঙ্গল বিধান। আমি মূর্খ—নিদারুণ মোহে প্রভুর ভাব বুঝিতে পারি না। প্রভু আমার হিত করিতেছেন, আমি বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া থাকি। ভট্ট এই চিন্তাতরঙ্গে উদ্বেলিত, ভাবাবেশে বিনিদ্র রজনী কাটাইলেন—প্রভুর অপার করুণার কথা স্মরণ করিতেই সেই বিশ্বপ্লাবী প্রেম ও করুণার মোহন মূর্তি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল। ভট্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রভাতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে প্রভুর চরণতলে ছুটিয়া আসিলেন, ভক্তি-গদগদকণ্ঠে প্রভুকে বলিলেন—

"আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা কৈলা।
আপনার করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥

* * *

তোমার কৃপা-অঞ্জনে এবে গর্ব-অন্ধা গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥"

ভট্টের পাণ্ডিত্য গেল. অভিমান গেল—দীনাতিদীন বৈষ্ণবের ভাস্বর জ্যোতিতে ভট্ট দীপ্তিমান হইলেন। ভট্টের দৈন্যোক্তিতে প্রভু বিচলিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত, তোমার ত গর্ব থাকা উচিত নয়, শ্রীধর স্বামীর নিন্দা করিয়া নিজকৃত টীকার বড়াই কর। শ্রীধর স্বামীকে মান না, এত গর্ব ধারণ কর, শ্রীধর স্বামী জগৎগুরু। তাঁহার প্রসাদে ভাগবত জানিয়াছি।"

"শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোকে মান্য করি করিবে গ্রহণ॥"

পরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—

"শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্তন ॥
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ চরণ ॥"

এইরূপে ভট্টের উদ্ধার সাধিত হইল।

১৩

রঘুনাথদাস-মিলন প্রভুর নীলাচল-লীলার এক মনোজ্ঞ কাহিনী। সে কাহিনী বর্ণনায় লেখনী পবিত্র হয়, হৃদয় সরস হয়, ক্ষণকালের নিমিত্তও সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া যায়; রঘুনাথ গোস্বামী ছয় গোস্বামীর অন্যতম—জগৎপাবন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সজীব বিগ্রহ। রঘুনাথের মর্মস্পর্শী জীবন-ইতিহাস বৈষ্ণবগণের চির আদৃত। রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র। হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই সহোদর। তাঁহারা সপ্তগ্রামের বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কাজেই রঘুনাথ বিপুল ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত—পিতামাতার অপ্রমেয় স্নেহ-বাৎসল্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু শৈশবাবধি রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্য, বিষয়ে ঔদাসীন্য। সংসারের কোন বন্ধন তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। সন্ন্যাস লইয়া মহাপ্রভু যখন প্রথমে অদ্বৈত-ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে রঘুনাথ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া নীলাচল যাত্রা করিলে রঘুনাথ বিহ্বলচিত্তে গৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতেন এবং পিতামাতা তাঁহাকে পথ হইতে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। পাঁচজন সেবক দুইজন ব্রাহ্মণ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার শান্তিপুর আগমন করিলে রঘুনাথ পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হন এবং স্বীয়

হুবিষহ জীবনকাহিনী আনুপূর্বিক নিবেদন করেন। প্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া তখন বলিয়াছিলেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥"

গৃহস্থাশ্রম ভগবৎ-সাধনার অন্তরায়—সংসারের কোমল বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া নির্মম সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন না করিলে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের আশা নাই —এই ধারণা আবহমান কাল হইতে মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল। ভগবৎ কৃপালব্ধ সাধকবৃন্দের সংসারে গভীর অনাসক্তি, বিষয়ে তীব্র বীতরাগ ও কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শও এই ধারণারই পরিপোষক। সকল সাধনার মূল ভগবানে অনুরাগ। সাধন-ভজন দ্বারা সুকৃতিবশে জীবের এই পরম লোভনীয় অনুরাগের অঙ্কুর জন্মিলে বিষয়ে বৈরাগ্য—"আসক্তিরণভিষঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু"—আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। সন্ন্যাস বাহিরের বস্তু নয়—মনের। মন হইতে যাঁহার বিষয় ত্যাগ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু এই ত্যাগ, এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে সংসার হইতে ছুটিয়া গেলে চলিবে না—সংসারের শত মোহাবরণের মধ্যেই তাহা লাভ করিতে হইবে। অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ তাহা পাইতে হইবে। বিষয় ভোগ হইতে দূরে থাকিলেই আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অনাসক্তি মানব-হৃদয়ের ক্রমিক বিকাশ,—জীবনব্যাপী সাধনার সুদুর্লভ ফল। মর্কট-বৈরাগ্য সাধনার পরিপন্থী। মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা গীতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি।

সংসার কি ভগবান ছাড়া? সংসারের প্রতি অঙ্গের, জীব-হৃদয়ের প্রতি বৃত্তির সার্থকতা আছে। জীব কি, জড়জগতের কোন বস্তুই নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই। সংসারের যে প্রীতি—ভালবাসার যে অনাবিল স্নিগ্ধধারা আমাদিগকে নিয়ত সিঞ্চিত করিয়া কর্মক্লান্ত দেহ-মন মধুময় করিয়া থাকে, তাহা ভগবানের প্রতি জীবের স্বাভাবিক অনুরাগেরই রূপান্তর মাত্র। মানব স্থূলদেহে এই বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ পরিশীলন দ্বারা ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরাগ লাভ করিতে

পারিবে, এই জন্যই কল্যাণপ্রদ সংসার-বন্ধনের সৃষ্টি। ইহা বন্ধনপাশ নহে—মুক্তির সেতু। সংসার যাঁহার, সন্ন্যাসও তাঁহারই। ভোগের মধ্য দিয়া না গেলে ত্যাগে পটুতা—দৃঢ়তা আসিতে পারে না। আশৈশব বৈরাগ্য—জন্মান্তরীণ বিষয়-ভোগজনিত বাসনা নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিপক্ক স্বাদু ফল।

রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত শিক্ষা মত বাহ্যিক বিষয়ীর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

"ভিতরে বৈরাগ্য বাহিবে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।"

বৎসরাধিক কাল গৃহবাস করিয়া রঘুনাথ দারুণ উৎকণ্ঠায় পুনরায় নীলাচলে পলাইয়া যাইবার উপক্রম করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন না। পথ হইতে পিতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। মাতা বলিলেন "ছেলে পাগল হইয়াছে—বাঁধিয়া রাখ।" উত্তরে গোবর্ধন বলিলেন—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডিতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥"

এই তো রঘুনাথ-পিতার উপযুক্ত কথা। রঘুনাথের গৃহবাস ক্রমে অসহনীয় হইল। তিনি গোপনে গৃহত্যাগের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ বহির্বাটীতে দুর্গামণ্ডপে রাত্রি যাপন করিতেন। কিন্তু প্রহরীগণ সর্বদাই সতর্ক থাকিত। তিনি পলায়নের কোন সুযোগই পাইতেন না। একদিন রাত্রিশেষে রক্ষকগণের নিদ্রাবস্থায় তাঁহার গুরুদেব যাদবানন্দ আচার্য জনৈক শিষ্য সেবাধর্ম ত্যাগ করায় তাঁহাকে সাধিবার জন্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া রঘুনাথ একক শিষ্যগৃহে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় গুরুদেব তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া রঘুনাথকে একক যাইতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে নিঃসঙ্গী হইয়া উপযুক্ত সুসময় বিবেচনায় রঘুনাথ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্পন্দিত বক্ষে "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া পূর্ব মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ে ভয়ে রঘুনাথ চলিয়াছেন। দ্রুত—অতি দ্রুত। বিগতযাম রাত্রির শেষ নীরবতা রঘুনাথের ত্রস্ত পদক্ষেপে মুখর হইয়া উঠিল। তাঁহার কম্পিত বক্ষের ঘন স্পন্দন নৈশবায়ুহিল্লোলে ভাসমান হইয়া

বুঝি বা মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে উপনীত হইল। রঘুনাথ চলিতেছেন আর সভয়ে কেহ অনুসরণ করিতেছে কি না পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছেন। পথ ছাড়িয়া বন্ধুর উপপথে চলিয়াছেন। রঘুনাথের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ক্ষুৎপিপাসায় যে ক্রমে কাতর হইতেছেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য—কেমন করিয়া সংসার ছাড়িয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইবেন। সাধন-জগতে এ চিত্রের বুঝি বা তুলনাই নাই। এক দিবসে পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া রঘুনাথ এক গোপের আলয়ে উপস্থিত হন এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া পড়িয়া থাকেন। দ্বাদশ দিবসে তিনি পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার জুটিয়াছিল। মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া প্রভুচরণ ধারণ করিলেন। প্রভু রঘুকে "আইস" বলিয়া সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু রঘুনাথের পথশ্রমে জীর্ণ মলিন দেহদর্শে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে গোবিন্দকে বলিলেন—"গোবিন্দ, রঘু বড় কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তুমি কতক দিবস রঘুকে সন্তর্পণ করিও।" প্রভু বলিলেন—

"কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষম বিষ্ঠা গর্ত হৈতে॥"

রঘুনাথ উত্তরে বলিলেন,—"প্রভু, আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না—আমি জানি তোমার কৃপাই আমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" প্রভু রঘুনাথের হস্তধারণ করিয়া আর্দ্রচিত্তে স্বরূপকে কহিলেন—

"রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥"

নীলাচলে তিন রঘুনাথ ছিলেন। অদ্য হইতে দাস রঘুনাথের নাম হইল "স্বরূপের রঘু"। অতঃপর রঘুনাথের সহিত সকল ভক্তের মিলন হইল। প্রভুর এমন কৃপাপাত্র রঘুনাথকে সকল ভক্তই বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য, অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও ভজনের কঠোরতা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রঘুনাথ দিবসব্যাপী নাম-কীর্তনে আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। আহার সংস্থানের কোন যত্ন করিতেন না। দিনান্তে ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন। পূর্বাবধি এই নিয়ম চলিত আছে, জগন্নাথদেবের সেবকগণ সেবা অন্তে রাত্রিতে গৃহ গমনকালে নিষ্কিঞ্চন কোন অন্নার্থী বৈষ্ণবকে সিংহদ্বারে দেখিলে তাঁহাকে অন্নদান করিতেন। এই কৃপালব্ধ প্রসাদান্নই রঘুনাথের একমাত্র সম্বল হইল।

প্রভু শুনিয়া তুষ্ট হইয়া বলেন—

"ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা।"

এক দিবস রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে নিজ কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্তব্য প্রভু কর উপদেশ।"

রঘু নিজে কখনও প্রভুর সম্মুখে কথা বলিতে পারিতেন না। তাই স্বরূপের দ্বারা নিজ কর্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। স্বরূপ বলিলেন—"প্রভু, রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখন তাহার কর্তব্য কি? রঘু শ্রীমুখে তাহা শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছে।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি স্বরূপের নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শেখ, আমি যত না জানি, স্বরূপ তাহা জানে।" পবে সংক্ষেপে রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে উপদেশ দিলেন—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"*

রঘুনাথসহ গৌড়ীয় ভক্তগণেব মিলন হইল। গুণ্ডিচা-মার্জন, রথযাত্রায় নৃত্য ও কীর্তন দর্শনে রঘুনাথ চমৎকৃত ও আনন্দে আপ্লুত হইলেন। অদ্বৈত আচার্য রঘুকে বহু কৃপা করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে প্রত্যাগমন করিলে বঘুনাথের পিতা তাঁহাদের নিকট সমস্ত কথা জানিবাব জন্য লোক পাঠাইলেন। শিবানন্দ কহিলেন—

"তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে॥
*　　*　　*　　*
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণ সম॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ॥"

এই বিবরণ জানিয়া পিতামাতা বড় সন্তপ্ত হইলেন। কোন্ পিতামাতাই বা একমাত্র পুত্রের এই কঠোরতায় বিচলিত না হইবেন। শত ভোগ-বিলাসের

* "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

মধ্যে পরিবর্ধনশীল পুত্রের উপবাসের সংবাদ অবগত হইয়া গোবর্ধন অবিলম্বে দুই ভৃত্য এবং এক ব্রাহ্মণসহ প্রচুর অর্থ নীলাচলে পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ তাহা গ্রহণ না করাতে, প্রেরিত লোক নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিল।

রঘুনাথ প্রথম প্রথম অনেক যত্নে মাসে দুইদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু কিছুদিন পর তাহা বন্ধ করিলেন। প্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘু আমার নিমন্ত্রণ ছাড়িল কেন?" স্বরূপ বলিলেন—"বিষয়ীর অন্নে নিমন্ত্রণ-রক্ষিত হয় বলিয়া রঘু নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

বৈরাগ্য ও সাধনপথে তীব্র কঠোরতার যে পুণ্য আদর্শ রঘুনাথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিমল জ্যোতি কোন কালে ম্লান হইবে না। তাহার সম্মুখে ধর্মজগৎ চিরকাল নতশীর্ষ হইবেন। রঘুনাথ কিছুদিনের মধ্যে ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন। তুচ্ছ আহারের জন্য সিংহদ্বারে অপেক্ষা করা—এত বড় লজ্জা ও ঘৃণার কথা বৈষ্ণবের আর কি হইতে পারে? বৈষ্ণবের যে দেহরক্ষার চেষ্টা গৌণ কর্ম—সাধন ভজনই মুখ্য। ভজনের জন্যই বৈষ্ণব দেহরক্ষা করেন, তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য নাই। জগন্নাথ-সেবকগণ অন্নার্থী রঘুনাথকে না জানি কি মনে করেন! ছিঃ! রঘুনাথ ছত্রে গিয়া মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয় ভক্ত রঘুনাথের প্রতি কার্য প্রভু স্মিতবদনে সমর্থন করিতেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন—"রঘু বেশ করিয়াছে—

ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
মনঃ কথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥"

রঘুনাথের দৈনন্দিন জীবন বহন প্রণালী প্রভুর উত্তর উত্তর প্রীতিবর্ধক হইল। প্রভু প্রসন্ন হইয়া বৃন্দাবন হইতে আনীত গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুর হাতে অর্পণ করিলেন। এই শিলা ও গুঞ্জামালা শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আনিয়া প্রভুকে দিয়াছিলেন। প্রভু তিন বৎসরকাল তাহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। আজ প্রসন্নচিত্তে প্রভু সেই আদরের গোবর্ধন শিলা ও মালা রঘুকে দিলেন—

"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥"

সে সাত্ত্বিক সেবা—বিষয়ভোগবর্জিত বৈষ্ণবের নিষ্কাম সেবা! তাহাতে

বাহ্যাড়ম্বর কিছুমাত্র নাই—তাহা রজতমোগুণাত্মক সকাম ষোড়শোপচারে পূজার ভোগরাগাদি আড়ম্বরশূন্য। প্রভু বলিলেন—

"এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

প্রভুদত্ত শিলায় রঘুনাথ অনুরাগের সহিত পূজা আরম্ভ করিলেন—

"——রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল তুলসী সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥
* * * *
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ॥"

রঘুনাথের গুণ অনন্ত। তাহা বর্ণিবার সাধ্য কাহারও নাই। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা। রঘুনাথ ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর বিধি-নিয়মের মধ্যে নিজকে সংযত করিতে লাগিলেন। তিনি ছত্রে গিয়া মাগিয়া আহার-সংস্থানও পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি যে উপায়ে অন্নের সংস্থান করিতেন, তাহা বড় মর্ম্মচ্ছেদী করুণ কাহিনী।

"প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে॥"

লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়—হৃদয় গলিয়া যায়—পরম প্রেমিক—গৌরভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত যুগধর্মের মহান্ আদর্শ অনাদিকাল জীবজগতে প্রতিভাত রাখিবার উদ্দেশ্যে সেই পরিত্যক্ত, পর্য্যুষিত গলিত অন্নকণা রাত্রিতে গৃহে আনিয়া জল দ্বারা ধৌত করিয়া কেবল কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে গ্রহন করিতেন—অতুল বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারীর পক্ষে এরূপ কঠোরতা সাধারণ

মানববুদ্ধির অনধিগম্য। মহাপ্রভুর পার্ষদ ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। উত্তরকালে যাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম অনুসৃত হইবে, এরূপ ত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য কেবল তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত! স্বরূপ গোস্বামী এক দিবস এই অন্ন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"এই অমৃত তুমি প্রতিদিন আস্বাদন কর—আমাকে দাও না কেন?" অপর এক দিবস স্বয়ং প্রভু গোবিন্দের নিকট রঘুর এই অন্ন-সংস্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলের অলক্ষিতে ছুটিয়া আসিলেন এবং "কাঁহা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও কেন"—বলিতে বলিতে সহসা এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া মুখে দিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস তুলিতেই ব্যথিত স্বরূপ প্রভুর হাত ধারণ করিয়া বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন—

"তব যোগ্য নহে প্রভু"। কিন্তু—

"প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

ভগবান ব্যতীত ভক্তবৎসলতার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় কি? পরম ভক্ত রঘুনাথ গলিত পর্যুষিত অন্ন দ্বারা দেহ রক্ষা করিতেছেন, প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ছুটিয়া আসিয়া তাহাই অমৃতোপম বলিয়া মুখে দিতেছেন! বিদুরের ক্ষুদকণায় পরিতৃপ্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৎসলতার সহিতই কেবল এ-দৃশ্য তুলিত হইতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম এক রঘুনাথ দাসের আদর্শেই কিরণগোলকে মণ্ডিত সুমহান্ ও প্রোজ্জ্বল! রঘুনাথ মহাপ্রভুর ধর্মের পূর্ণ বিকাশ! যদি বৈষ্ণবধর্মের আর কেহ বা কিছু না থাকিয়া কেবল রঘুনাথই থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহা সর্বকাল সর্বজীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণে সমর্থ হইত।

১৪

মহাপ্রভু অহর্নিশি কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকিয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল।

"দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায় রামানন্দ সনে রস আস্বাদন॥"

নানা দিগ্‌দেশ হইতে গণনাতীত লোক নিত্য তাঁহাকে দর্শনের জন্য আগমন করিত এবং সে মনোমুগ্ধকর প্রেমকান্তি দর্শনমাত্রেই ভাবাবিষ্ট অচেতন হইত। দর্শন না মিলিলে বিপুল জনসংঘ বাহিরে থাকিয়া করুণ আর্তনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিত। সে আর্তনাদে প্রভু স্থির থাকিতে না পারিয়া স্মিতবদনে "কৃষ্ণ কহ" বলিয়া লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। প্রভুকে দর্শনমাত্রেই সকলে প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইত। নীলাচলে অবস্থান কালে অথবা দাক্ষিণাত্য বা বৃন্দাবন পথে মহাপ্রভুকে একবার দর্শনের জন্য জনমণ্ডলীর মধ্যে এক অভিনব উত্তেজনা লক্ষিত হইত। মহাপ্রভু কোন স্থানে যাইবার সংকল্প করিলে তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই গন্তব্য স্থান ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

গৌরাঙ্গদেবের প্রেম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব ভারতী তখন আর কাহারও অবিদিত ছিল না। প্রতাপান্বিত উৎকলরাজ ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি দেশপূজ্য মহাজন ব্যক্তির গৌরভক্তির বিবরণ তখন সর্বজনবিশ্রুত হইয়াছিল। মহাপ্রভুকে তখন আর কেহ সাধারণ মানব বলিয়া ধারণা করিত না। অনেকে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার দর্শনে যে নিদারুণ ভবব্যাধির উপশম হইবে, এ ধারণা স্বতঃসিদ্ধরূপে লোকের মনে উদিত হইত। মহাপ্রভুর প্রিয়দর্শন দেববপু একবার মাত্র দর্শনাভিলাষে লোক ব্যাকুল হইত। তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই তরঙ্গায়িত জনসংঘ এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরসে বিভোর হইয়া, দেহ ধর্ম ভুলিয়া যাইত।

কখনও কখনও এই আনন্দানুভূতি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া সকলকে তন্ময় করিয়া রাখিত। সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই শক্তিত্রয়ের সমবায়ে ভগবৎ-শক্তির পূর্ণতা। ভগবানের "হ্লাদিনী" বা "আনন্দ" শক্তির বিকাশ আমাদের জড়জগতেও পরিস্ফুট।

নদীর কলতানে—চন্দ্রের স্নিগ্ধ রজতধারায়—হিমানীমণ্ডিত অভ্রভেদী শৈলশৃঙ্গের বিরাট গাম্ভীর্যে—মহোদধির সীমাশূন্য নীলিমায়, পুষ্পিত তরুগুচ্ছের কুসুম-সুষমায়—সংসারের প্রেম ও প্রীতির শত মনোমদ চিত্রের মধ্যে সেই অপ্রাকৃত "হ্লাদিনী" শক্তিরই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেই নিত্য আনন্দের যে ক্ষীণ ধারা এই মরজগতে আসিয়া পড়িয়াছে—যে আনন্দ-সত্তার অতি ক্ষীণ অভিব্যক্তি জগতকে আনন্দময় ও চিরপ্রফুল্ল করিয়া থাকে—যে আনন্দময় পুরুষের শ্রীনামগুণকীর্তনে জীব আনন্দে আত্মহারা হইয়া উন্মাদের

ন্যায় আচরণ করে, কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও বা বাহ্যাপেক্ষা না রাখিয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে—শ্রুতির যিনি "রসো বৈ সঃ"—রসস্বরূপ—যুগধর্ম-প্রবর্তকরূপে তাঁহার লোকপাবন প্রেম-কান্তি দর্শনে যে আনন্দ উৎসারিত হইয়া মানুষকে তন্ময় করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্র সেই বিপুল জনবাহিনী যে অপার্থিব আনন্দে বিহ্বল হইয়া দেহ পরিজন বিস্মৃত হইত, ইহা তাঁহার ভগবৎ সত্তারই পরিচায়ক। জীবের হৃদয়নিরুদ্ধ আনন্দ-উৎস অপর কোন হেতুতেই এমন ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। এক জন মানব তত্তুল্য অপরকে দেখিয়া আনন্দে এমন আত্মহারা হইতে পারে না।

প্রভুর নীলাচলে অবস্থান কালে রায় রামানন্দের অন্যতম ভ্রাতা গোপীনাথ রাজ-রোষে পতিত হন। তিনি রাজ সরকারে কার্য করিতেন। রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দুই লক্ষ কাহণ কৌড়া রাজাকে যথাযথরূপে বুঝাইয়া না দেওয়ায় রাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার প্রাপ্য মুদ্রা উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে এক রাজপুত্রকে গোপীনাথের নিকট প্রেরণ করেন। গোপীনাথ রাজপুত্রের গর্বিত বচন উপেক্ষা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীনাথের প্রতারণা রাজার নিকট প্রকাশ করেন এবং রাজাদেশের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার দ্বারা অপমানের শোধ লইবার জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। গোপীনাথকে উচ্চ মঞ্চে চড়াইয়া এক শাণিত খড়্গ তাহার নীচে রাখা হয় এবং মঞ্চ হইতে গোপীনাথকে নিম্নে খড়্গের উপর নিক্ষেপ করিবার সমস্ত আয়োজন করা হয়। গোপীনাথের জীবন সংশয়। অপমানিত ক্রুদ্ধ রাজপুত্রের আদেশে রামানন্দের অপর ভ্রাতা বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বাঁধিয়া লওয়া হয়। গোপীনাথের আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ সংবাদ লইয়া তাঁহার আশ্রিত লোক প্রভুর চরণে দ্রুত উপস্থিত হয়। প্রভু শুনিয়া রোষাভাসে বলিলেন—"রাজা নিজ প্রাপ্য আদায় করিবেন। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমি কি করিব?"

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ প্রভুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোপীনাথের পিতা রায় ভবানন্দ গোষ্ঠীর সহিত প্রভুর পরম ভক্ত। রামানন্দ তাঁহার নিত্য সহচর। এই সঙ্কটকালে প্রভুর উদাসীন থাকা সঙ্গত নয়। এমন সময় আর একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গোপীনাথকে অচিরে খড়্গের উপর নিক্ষেপ করা হইবে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই নিদারুণ সংবাদে বিচলিত হইয়া প্রভুকে কাতরে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক, কি করিতে পারি? সকলে মিলিয়া শ্রীজগন্নাথ চরণে প্রার্থনা কর, তাঁহার কৃপা হইলে উদ্ধার হইবে।"

রাজমন্ত্রী হরিচন্দন তৎকালে প্রভু সকাশে ছিলেন। তিনি ত্রস্তে রাজাকে গিয়া জানাইলেন, গোপীনাথ রাজসেবক, তাঁহার চরম দণ্ড হওয়া কখনই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ড দ্বারা রাজ-প্রাপ্য আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। রাজা প্রাণদণ্ডের কথা জানিতেন না, তিনি তদ্রূপ কোন আদেশ দেন নাই। রাজা অবিলম্বে হরিচন্দনকে পাঠাইয়া গোপীনাথের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। গোপীনাথকে মঞ্চ হইতে নামান হইল। যে লোক গোপীনাথের দণ্ডের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, প্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাণীনাথকে যখন বাঁধিয়া লইল, তখন সে কি করিতেছিল ?

সংবাদদাতা বলিল—

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥"

ভগবৎ নিষ্ঠতার এই অপূর্ব বার্তা শ্রবণে প্রভু পরম আনন্দিত হইলেন। ইতিমধ্যে রাজগুরু কাশী মিশ্র প্রভু চরণে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—"দেখ, আমি আর নীলাচলে থাকিতে পারিতেছি না। শীঘ্রই আলালনাথে গিয়া অবস্থান করি। নানা উপদ্রবে আমার স্বস্তি নাই। ভবানন্দের পুত্র রাজদ্রব্যের অপচয় করায় তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল, আর তাহার লোক জন আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে জানাইতে আসিল। আমি নির্জনবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাহার দুঃখে আমার দুঃখ পাইতে হয়।"

"বিষয়ী বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইহাঁ রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥"

কাশী মিশ্র ভীত হইয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু, তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তোমার সহিত কাহার সম্বন্ধ—জ্ঞানান্ধ জনই কেবল বিষয়ের জন্য তোমার ভজন করিয়া থাকে।

"তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
তোমায় ভজে বিষয় লাগি সেই মূর্খ জন॥"

তোমার জন্য রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করিলেন—তোমার জন্য সনাতন মন্ত্রিত্ব ছাড়িলেন—তোমার জন্য রঘুনাথ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিলেন। তোমার ভজনে বিষয়ে ত্যাগ আনে—আসক্তি আনিতে পারে না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল তোমার

ভজন করিয়া থাকে। সে ভজন নিষ্কাম—তাহাতে বাসনার মলিনতা কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। গোপীনাথ মহাশয় ব্যক্তি—রায় রামানন্দের সোদর, তোমার দ্বারা বিষয় ভোগ কখনই তাহার বাঞ্ছা হইতে পারে না। তাহার আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাহার অগোচরে তাহার আশ্রিত লোকজন তোমাকে সংবাদ দিয়াছে। কেন প্রভু আলালনাথ যাইবে? আর কেহ তোমাকে বিষয় কথা বলিবে না।" কাশী মিশ্র বড আবেগেই কথাগুলি বলিলেন। কাশী মিশ্র গৃহে গমন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র দৈনিক গুরুপূজার নিত্য নিয়মানুসারে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কাশী মিশ্র প্রভুর আলালনাথ যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা ব্যথিত হইয়া বলিলেন—

"সব দ্রব্য ছাড যদি প্রভু রহে হেথা।"

* * *

"একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥"
"কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য কর প্রভু পদে নির্ম্মঞ্ছন ॥

* * *

"তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুক্তি তাহাবে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥"

মিশ্র বলিলেন—তোমার প্রাপ্য ছাড়িয়া দিলে প্রভু সুখী হইবেন না। রাজা তাহা প্রভুকে জানাইতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপর রাজা গোপীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ভবিষ্যতে যেন এমন কার্য না করেন প্রভৃতি মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিলেন। গৌরব করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত তাই বলিতেছেন—

"পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ বহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ॥
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে ॥
কাঁহা চাঙ্গে চডাইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥

* * *

বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥"

ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-কটাক্ষপাতে দরিদ্র শ্রীদাম ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দুঃখ বিদূরিত হইয়া সর্ব সমৃদ্ধি প্রাপ্তির আখ্যান মনে পড়ে। ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। বিষয়ের জন্য যিনি তাঁহাকে রাজসিক ভজনা করেন, তিনি বিষয়ই লাভ করিয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্"—এ যে তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। গোপীনাথের কাহিনী একদিকে যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যান সমর্থন করিতেছে, অপর দিকে প্রভুর প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রেম-ভক্তির গভীরতা প্রকাশ করিতেছে।

বর্ষান্তরে আবার গৌড়ীয় ভক্তগণের সমাগম হইল। নিত্যানন্দকে প্রভু পুনবার নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরপ্রেমবিহ্বল নিত্যানন্দ সে আদেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনুরাগভরে ছুটিয়া আসিয়াছেন। অনুরাগ বিধি-নিষেধের পার। বৈধী ভক্তি পথে যাহা অনুশাসন, রাগ-ভক্তিতে তাহার স্থান নাই। পূর্ব পূর্ব বারের মতই রাঘব পণ্ডিত তাহার ঝালি সাজাইয়া আনিয়াছেন। পত্নী দময়ন্তী নিপুণভাবে এক বৎসরের উপযুক্ত নানা অপূর্ব দ্রব্যসম্ভারে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। আবার সেই কীর্তন, সেই পরম মোহন নৃত্য, সেই প্রেমোচ্ছ্বাস নীলাচলবাসীকে ভাসাইয়া লইল। এবারও প্রভু সাত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া বেড়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

"কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল॥"

এবারও প্রভু সাত সম্প্রাদায় একত্র করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন—

"সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহা প্রেমাবেশে নাচে গৌর রায়॥"

স্বরূপ উড়িয়া পদ ধরিলেন—

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ।"

আর প্রেমাবিষ্ট প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"বোল বোল বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥

কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে কভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমূলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
গজ জগ পরি মম গদ্‌গদ্ বচন।

* * *

সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর।
সব লোক পাশরিল দেহ আত্ম ঘর॥"

ভক্তগণের শ্রম জানিয়া কীর্তন সমাপন হইল। সকলে আনন্দে সমুদ্রস্নান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আমরা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় একাধিকবার মহাপ্রভুর প্রেমভরে নৃত্য ও কীর্তনের বিবরণ উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ কীর্তন ও নৃত্যই তাঁহার লীলার প্রধান অঙ্গ, ইহাই তাঁহার প্রচারিত যুগধর্ম। এই ভজন অনর্পিত—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে ভগবদ্ভজনের এই সহজ পন্থা কাহারও জানা ছিল না। এই ভজন জীবহৃদয়ে সর্বদা মুদ্রিত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রভুকে শিক্ষাদাতা গুরুর আসন অধিকার করিয়া স্বীয় আচরণ দ্বারা তদানীন্তন প্রচলিত ভজন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছিল। এই পরিবর্তন বড় সহজসাধ্য ছিল না। ভগবান যে নিজ জন—আপনার হইতেও আপনার—প্রেমের পরিপূর্ণ আধার—তিনি যে জীবের কেবল দণ্ডদাতা নহেন—তাঁহার বিরাট ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীব তাঁহার ভজনে প্রবৃত্ত হইলে যে তাঁহার স্বরূপ কখনও উপলব্ধি করিতে পারিবে না—নিজ তুচ্ছ ক্ষুদ্রত্বে চিরকাল পঙ্গু হইয়াই থাকিবে—তাঁহাকে পাইতে হইলে যে প্রেমভক্তির প্রয়োজন—শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় যে সে প্রেমভক্তি লাভ হয় না—এই বিরাট সত্য এতকাল অজ্ঞাত ছিল। সঙ্কোচ বা ভয়ের অঙ্কুর মাত্র থাকিতেও গীত বা নৃত্য আসিতে পারে না। জীব তখনই কেবল ভগবানের নামে গাহিতে বা নাচিতে পারে, যখন সে ভগবানের ঐশ্বর্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রেমময় নিজ জন বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হয়। কি নবদ্বীপে গার্হস্থ্য-লীলায়, কি নীলাচলে বা দাক্ষিণাত্যে, মহাপ্রভু অহরহঃ স্বয়ং নৃত্য-কীর্তন দ্বারা ভগবানের প্রতি জীবের এই ভাব স্থায়ী হইয়া তৎপ্রবর্তিত ভজনে যাহাতে অনুরাগ জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত কীর্তনের

পুনঃ পুনঃ আলোচনার আরও সার্থকতা আছে। ইহার মাধুর্য বড চিত্তাকর্ষক। ঘোর বিষয়াসক্ত মানবও মহাপ্রভুর প্রেমভরে নৃত্য ও কীর্তনের অলোকিক বিবরণে মুগ্ধ এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে। যে আলোচনা মুহূর্তকালের জন্যও বিষয়াসক্ত জীবহৃদয়ে এই ভাব জাগ্রত করিতে পারে, তাহা কখনই নিরর্থক বা পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না।

১৫

আমরা ক্রমে মহাপ্রভুর অন্তলীলায় এক শোকাবহ বিচ্ছেদ-কাহিনীতে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগন লইয়া কীর্তন-বিলাসে নীলাচলে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ প্রতি দিবস মহাপ্রসাদ লইয়া ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার আশ্রমে দিয়া আসিতেন। এক দিবস গোবিন্দ প্রসাদ লইয়া হরিদাস মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়া মৃদুমন্দস্বরে নাম-কীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ লইতে আহ্বান করিলে, তিনি বলিলেন, আমার আজ লজ্ঘন। নির্দিষ্ট সংখ্যা নাম-কীর্তন সমাধা হয় নাই, কেমনে জলগ্রহণ করিব? পূর্বেই বলিয়াছি, হরিাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম-কীর্তন সমাপন না করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ কবিতেন না। মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারেন না, কাজেই গোবিন্দ-দত্ত প্রসাদের এক কণা লইয়া হরিদাস মুখে দিলেন। আর দিবস মহাপ্রভু হরিদাসেব নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হরিদাস সুস্থ আছ তো?"

হরিদাস প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু মন সুস্থ নাই।"

প্রভু বলিলেন—"তোমার কি ব্যাধি?"

উত্তরে ঠাকুর বলিলেন—"সংখ্যা কীর্তন না পূরয়।"

প্রভু আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—

"—বৃদ্ধ হৈলা এবে সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন॥"

হরিদাস আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি হীনজাতি—অধম, পামর, অস্পৃশ্য—তুমি আমাকে রৌরব হইতে বৈকুণ্ঠে তুলিয়াছ—আমাকে মহা কৃপা করিয়াছ—তুমি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান—যাহাকে যেরূপে নাচাইতে ইচ্ছা কর, সেইরূপই নাচাইয়া থাক। কিন্তু আমার ধারণা হইয়াছে, তুমি সত্বরেই লীলা সংবরণ করিবে। বহুদিন হইতে প্রভু আমার একটি সাধ আছে—

"সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে॥"

প্রভু বিচলিত হইলেন। উত্তরে বলিলেন—"হরিদাস, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, কৃপাময় কৃষ্ণ তাহাই পূরণ করিবেন। কিন্তু আমার যা কিছু আনন্দ সব তোমাকে লইয়া। আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়।"

হরিদাস প্রভুর চরণ ধরিয়া আবেগ-মথিত স্বরে বলিলেন—"প্রভু, এই দয়া অবশ্য করিবে—আমার জন্য আর মায়া করিও না।

"মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়॥
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল॥

ভক্তবৎসল বলিয়া তুমি জগতে বিদিত, আমার এই আশা পূর্ণ কর প্রভু।"

মহাপ্রভু সে দিবস আর কিছু না বলিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে সর্বভক্ত সঙ্গে প্রভু হরিদাস-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস প্রভু ও ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিলেন।

"প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥"

ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ গৌরলীলার অন্যতম পুণ্য কাহিনী। মহাযোগেশ্বর হরিদাস ঠাকুরের তিরোধানের বিবরণ শোকাবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শোক জগৎ পবিত্রকারী। সে কাহিনীতে মনে অবসাদ আসিতে পারে না। যুগে যুগে গৌরভক্তগণ সে কাহিনীর পবিত্র গাথা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় মন নির্মল করিবেন।

প্রভু হরিদাসের অঙ্গনে মহাকীর্তন আরম্ভ করিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ হরিদাসকে বেড়িয়া নাম সঙ্কীর্তন ও পণ্ডিত বক্রেশ্বর নৃত্য করিতে লাগিলেন। রামানন্দ, সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মুখে প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হরিদাসের গুণ শ্রবণে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং সর্ব ভক্ত তাঁহার বন্দনা করিলেন। ক্রমে সেই পবিত্র শুভ মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্ব হৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব ভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥"

"কৃষ্ণ হরি" নামের মহা মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত ছাইয়া ফেলিল। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন।

"হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥"

অতঃপর ঠাকুর হরিদাসের দেব দেহ বিমানে চড়াইয়া সমুদ্র তীরে লইয়া যাওয়া হইল।

সর্বাগ্রে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন আর পশ্চাতে নর্তনশিরোমণি বক্রেশ্বর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। হরিদাসকে

সমুদ্রজলে স্নান করান হইল। প্রভু বলিলেন—

"সমুদ্র আজ মহাতীর্থ হৈল।"

ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। মহাপ্রভু "হরিবোল" বলিয়া তাহার গাত্রে বালুকা দিলেন। চতুর্দিকে আনন্দ কীর্তনের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরকে সমাবিষ্ট করা হইল। সকল ভক্ত প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইয়া হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং বিহ্বলচিত্তে পুনরায় নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

"হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।"

সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রভু স্বয়ং আঁচল পাতিয়া সকল পসারির নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ তো আমারে॥"

ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসবে স্বয়ং প্রভু ভিক্ষায় নামিয়াছেন। এ যে বড় করুণার দৃশ্য! এ দৃশ্য নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করা বড় কঠিন। জগন্নাথদেবের প্রসাদ-বিক্রেতাগণ এ দৃশ্যে বিচলিত হইলেন। যাঁহার পাত্রে যত প্রসাদ ছিল, তিনি মহানন্দে তাহা উজাড় করিয়া প্রভুর অঞ্চল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রভু ভিক্ষায় নামিলে এইরূপই হইল। আর একবার প্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচল পথে স্বয়ং ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। সে দিনও এই প্রকার দৃশ্যই সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। তেজঃপুঞ্জ নবীন সন্ন্যাসীর সে কমনীয় কিশোর মূর্তি গৃহস্থের নয়নপথে পতিত হওয়া মাত্রই ভাগ্যবান গৃহস্বামী তাহার সর্বস্ব প্রভুর ভিক্ষার ঝুলিতে উজাড় করিয়া জন্ম-জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু স্বয়ং প্রসাদ সংগ্রহ করিলে তাহার পরিমাণ কত হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু স্বরূপ তাহা করিতে দিলেন না। তিনি সকল পসারিকে বলিলেন—"তোমরা একেক দ্রব্যের পূরা আমাকে দেও"। এইরূপেই পর্যাপ্ত প্রসাদ সংগৃহীত হইল। সকল বৈষ্ণব "হরিধ্বনি" করিয়া ভোজনে বসিলেন। পরিবেশনকারী স্বয়ং মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু যেরূপে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন। মহাপ্রভু একেক জনের পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু যে তন্ময়। এ যে তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত হরিদাসের

বিজয়োৎসব। প্রভুর কি আর প্রসাদের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য আছে? স্বরূপ বলিলেন—"প্রভু, তুমি বসিয়া দেখ, আমি সকলকে পরিবেশন করিতেছি।" তখন স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর—এই চার জন পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রভু না বসিলে কোন বৈষ্ণব ভোজন করিবেন না। প্রসাদ পাতে লইয়া সকলে হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। কাজেই প্রভুকেও বাধ্য হইয়া পুরী ভারতীর সহিত ভোজনে বসিতে হইল। আকণ্ঠ পূরিয়া সকলে ভোজন করিলেন। প্রভু এক একবার "দেহ দেহ" বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভোজন ও আচমনান্তে প্রভু সকলকে স্বহস্তে মাল্য চন্দন পরাইয়া প্রেমাবষ্টে বর দিলেন—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা সেই করিল প্রকাশ॥"

আমরাও নাম-যজ্ঞের মহাসাধক ঠাকুর হরিদাসের জয় ঘোষণা করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামৃতম্ ॥

আবার গৌড়ীয় ভক্তগণের বাৎসরিক অভিযানের কাল সমাগত হইল। নবদ্বীপে ভক্তবৃন্দ আবার একত্রিত হইলেন। দুই তিন শত ভক্ত শচীমাতার চরণ বন্দনা করিয়া প্রভু দর্শনে ধাবিত হইলেন। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জন, রথাগ্রে নর্তন প্রভৃতি উৎসবে মহানন্দে যোগদান করিলেন। ভক্তগণের বিদায়কালে প্রভু মধুর বচনে বলিলেন—

"প্রতি বৎসর তোমরা এই সুদূর নীলাচলে আমাকে দেখিতে আইস—প্রতিবারেই আসিতে যাইতে কত দুঃখ পাইয়া থাক—তোমাদের দুঃখ দেখিয়া পুনর্বার আসিতে নিষেধ করিতে চাই, কিন্তু পারি না। তোমাদের সঙ্গলাভের আনন্দে লোভ হয়। নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকিতে বলিয়াছিলাম, না শুনিয়া আবার আসিয়াছেন। আমার জন্য তোমরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পরিজন সকল পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আইস। আমি সন্ন্যাসী—কেমন করিয়া তোমাদের এ ঋণ শোধ করিব?"

প্রভুর কথা শুনিয়া সকলে আঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুও ভক্তগণের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর এ চাঞ্চল্য কেন? বিরহ ক্রন্দন প্রকৃত জীবের পক্ষেই শোভা পায়—প্রভুর এ দৌর্বল্য কেন? কি নিগূঢ় কারণে মহাপ্রভুর এ বিরহ রোদন, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। তবে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়, ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল-প্রেমাশ্রুতে তিনি যেমন সিক্ত হইয়া হৃদয় মন পবিত্র করিয়া থাকেন, বিশ্ব-প্রেমের পরিপূর্ণ আধার প্রেমময় ভগবানও ভক্তের জন্য বুঝি বা সেইরূপই কাঁদিয়া থাকেন। ভক্ত কাঁদিলে ভগবানকেও কাঁদিতে হয়—নতুবা তাঁহার ভক্তবৎসল নামের যে সার্থকতা থাকে না। গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রেম-ক্রন্দন তাই মহাপ্রভুর নয়নে প্রেমাশ্রু আনয়ন করিল। এ ভক্তি-রাজ্যের খেলা। আমরা এই স্থানে প্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দের কিঞ্চিৎ কাহিনী বলিব। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। মুকুন্দের প্রেমের মতই তাহা বড় শুদ্ধ, বড় পবিত্র ও নির্মল।

পণ্ডিত প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শচীমাতার তত্ত্ব লইতে নবদ্বীপে আগমন করিতেন। মহাপ্রভুর সংবাদ সহ পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিতেই ম্রিয়মান নবদ্বীপ সজীব হইয়া উঠিত। যে কয়েক দিবস পণ্ডিত নবদ্বীপে অপেক্ষা করিতেন, তাহা নিত্য আনন্দোৎসবে মগ্ন থাকিত। উৎসব আনন্দ কেবল মহাপ্রভুকে লইয়া। তাঁহারই নাম, তাঁহারই গুণ, তাঁহারই প্রেম ও করুণার অপূর্ব বারতা জগদানন্দ ভক্তি-বিগলিতকণ্ঠে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে বিলাইয়া যাইতেন। আর বিরহ-কাতর নবদ্বীপের মৃতকল্প প্রাণে তাহা শান্তি ও আনন্দের সঞ্জীবনী ধারা ঢালিয়া দিত।

পণ্ডিতের সহিত শচীমাতার মিলন বড় হৃদয়গ্রাহী। পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়াই শচীমাতাকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ ও মিনতি-স্তুতি করিতেন। কখনও বা তাঁহাকে প্রভুদত্ত বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ প্রদান করিতেন। রাত্রিদিন মাতাব আর কোন কথাই নাই, কেবল তাঁহার নিমাইলের কথা। জগদানন্দ বলিতেন—"মা, কোন কোন দিন প্রভু আসিয়া তোমাব অন্ন-ব্যঞ্জন অলক্ষিতে ভোজন করিয়া যান।" মাতা বলিতেন—"আমি উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করিলে মনে সাধ হয় আমার নিমাই আসিয়া ভোজন করুক—পরে তাহাকে না দেখিয়া নীরবে কেবল অশ্রুপাত করিতে থাকি।" এইরূপে মহাপ্রভুব কথায় মাতা আনন্দ-রসে বিভোর থাকিতেন। পণ্ডিতকে পাইয়া আচার্যাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ অনুভব করিতেন। জগদানন্দও মহাপ্রভুর কথায় একেবারে গলিয়া যাইতেন।

এক যাত্রায় পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার কালে এক কলসী সুগন্ধি তৈল বহিয়া নীলাচলে আনিলেন এবং গোবিন্দকে কলসী প্রদান করিয়া বলিলেন—"গোবিন্দ, এই তৈল প্রভু-অঙ্গে দিও।" গোবিন্দ প্রভুকে বলিলেন, "জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে বড যত্ন করিয়া চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই তৈল প্রভু মস্তকে ব্যবহার কবেন—ইহাতে পিত্তবায়ুর প্রকোপ শান্ত থাকে।"

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীব নাহি তৈলে অধিকার।
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥"

কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে আবার এক দিবস গোবিন্দ প্রভুকে পণ্ডিতের অনুরোধ জানাইলেন। প্রভু এবার সক্রোধে বলিলেন—

"এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যেই পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥"

গোবিন্দ আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত প্রভুর নিকট আসিলে প্রভু বলিলেন—"তুমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছ—আমি সন্ন্যাসী, তৈলে তো আমার অধিকার নাই, তৈল আমি লইতে পারি না। জগন্নাথের দীপের জন্য তৈল দাও—তোমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।" জগদানন্দের প্রেম বড় নিগূঢ়। যে প্রেমে ভগবানের প্রতি আব্দার চলে—অভিমান চলে, এ সেই দুর্লভ অপার্থিব প্রেম। ভাগবতের সত্যভামার প্রেমের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া পণ্ডিত অভিমানে ফুলিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—

"—কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥"

—বলিতে বলিতে সহসা গৃহ হইতে তৈল-কলসী আনিয়া প্রভুর সম্মুখেই আঙিনাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং দ্রুতপদে স্বগৃহে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে দুই দিবস অতীত হইল, পণ্ডিতের প্রেমাভিমান গেল না। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববৎ রুদ্ধদ্বার গৃহে পড়িয়া আছেন। অভিমানভরে ভক্ত অনাহারী—প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন। তৃতীয় দিবসে অরুণোদয় হইতেই প্রভু পণ্ডিতের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সস্নেহে ডাকিলেন—"পণ্ডিত, উঠ --

"আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধন।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশন॥"

প্রভু স্বয়ং আসিয়া ভিক্ষার্থী। করুণার প্লাবনে অভিমান ভাসিয়া গেল। পণ্ডিত শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়া নানা উপাদেয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। ভোজন দশ গুণ হইল।

"কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।"
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥"

ভোজনান্তে প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, "তুমি এইখানে থাক, পণ্ডিত ভোজন করিলে আমাকে সংবাদ দিবে।" প্রভু-জগদানন্দে এই প্রকার প্রেম-কোন্দল

মধ্যে মধ্যে হইত। প্রভু নীলাচলে সন্ন্যাসের তীব্র কঠোরতা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেন, কিন্তু সে কঠোরতায় ভক্তগণ সর্বদা ব্যথিত থাকিতেন। তিনি কলার শরলাতে শয়ন করিতেন। কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখে প্রভুর শরীর-মন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। শীর্ণ শরীর—তাহাতে শরলার শয়নে অঙ্গে ব্যথা লাগিত। ভক্তগণ নিতান্ত দুঃখে ইহা সহ্য করিতেন। এক দিবস জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্রাবাস গেরুয়া রঙ্গে রঙ্গিন করিয়া শিমুল তুলা দিয়া পূর্ণ করিলেন। এই তুলার বালিশ গোবিন্দকে দিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভুকে ইহাতে শয়ন করাইও।" পরে স্বরূপকে বলিলেন—"আজ তুমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রভুকে শয়ন করাইও।" তুলার বালিশ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—"ইহা করাইল কোন জন।" জগদানন্দের নাম শ্রবণে প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন। আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু প্রভু কিছুতেই তুলাব বালিশে শয়ন করিলেন না। ভক্তগণের সমস্ত যত্ন ব্যর্থ হইল। স্বরূপ গোসাঞি তখন বহু কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা নখ দিয়া চিরিয়া সূক্ষ্ম করিলেন এবং প্রভুর দুই খণ্ড বহির্বাসে তাহা ভরিয়া প্রভুকে তাহার উপর শয়ন করিতে সকলে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঐকান্তিক অনুরোধ ও ব্যাকুল প্রার্থনায় প্রভু তাহা উপেক্ষা কবিতে পারিলেন না।

পণ্ডিত জগদানন্দের গৌর-প্রেমের গভীরতা দেখাইবার জন্য আর একটি আখ্যান বলিব। পণ্ডিত অনেক দিন যাবৎ বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া মহাপ্রভুর অনুজ্ঞায় এতকাল তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রভুর আজ্ঞা লইয়া পণ্ডিত বৃন্দাবন যাত্রা কবিলেন। প্রভু তাঁহাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। বৃন্দাবন যাইয়া সর্বদা সনাতনের সঙ্গে বাস ও বন দর্শন করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতনের সঙ্গলাভ করিলেন। সনাতন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনের সমস্ত দেবস্থলী দেখাইতে লাগিলেন। সনাতনের সঙ্গলাভে পণ্ডিতের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতে লাগিল। এক দিবস পণ্ডিত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় সনাতন একখণ্ড রক্তিম বহির্বাস মস্তকে বাঁধিয়া জগদানন্দের বাসদ্বারে উপস্থিত। সনাতনের মস্তকে বাঁধা বস্ত্র দেখিয়াই মহাপ্রভু-প্রদত্ত বস্ত্র অনুমানে পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কাঁহাতে পাইলে এই রাতুল বসন।"

মনে দৃঢ় বিশ্বাস গৌর-প্রেমিক সনাতন মহাপ্রভুর দত্ত বসনই বলিবেন। কিন্তু সনাতন উত্তরে বলিলেন—"মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন।"

উত্তর শ্রবণে পণ্ডিত আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি দেশ, কাল, পাত্র ভুলিলেন। সনাতন যে বৈষ্ণব-চূড়ামণি—বৈষ্ণব-জগতের শিক্ষাগুরু, তাহা ভুলিলেন। তিনি যে স্বয়ং মহাপ্রভুর পরম শ্রদ্ধাপাত্র, পণ্ডিত তাহাও বিস্মৃত হইলেন। পণ্ডিত ক্রোধভরে চুল্লিতে স্থাপিত অন্নের হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। মুহূর্তের আবেগ কাটিয়া গেল। পণ্ডিত প্রকৃতিস্থ হইয়া এই বাল-চপলতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥"

সনাতন আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—"সাধু পণ্ডিত, সাধু, তোমার ন্যায় প্রিয় মহাপ্রভুর আর কেহ নাই।"

"ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥"

পরে স্মিতমুখে বলিলেন—"অরুণ বসন বৈষ্ণবের যোগ্য নয়। এ বস্ত্রে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যে প্রেমের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে। মহাপ্রভুর প্রতি সেই প্রেম দর্শনে জীবন ধন্য হইয়াছে। এ বস্ত্র কোন প্রবাসীকে দান করিব।"

উভয়ে আনন্দে প্রসাদ পাইলেন এবং আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া প্রভু-বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস জগন্নাথ-মন্দিরে জনৈক দেবদাসী গুর্জ্জরী রাগে সুমধুর স্বরে গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেছিল। দূরাগত গীতগোবিন্দের মধুব স্বর-লহরী প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট কবিল। কে গান গাহিতেছে, স্ত্রী কি পুরুষ, কোথায় গান হইতেছে, প্রভুর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি গীত উদ্দেশ্যে আবেশে ছুটিলেন। পথে সিজের কাঁটায় শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরপাত হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই—ধাইয়া চলিয়াছেন। শশব্যস্তে গোবিন্দ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। প্রভু গায়িকার অতি নিকটবর্ত্তী। রুদ্ধশ্বাস গোবিন্দ দ্রুত আসিয়া "স্ত্রী গান" বলিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। "স্ত্রী গান" কর্ণে প্রবেশমাত্র প্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি হইল। বলিলেন—

"গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"

কোন যুগে—কেহ কি এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন?

এই সময় তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভু চরণে উপস্থিত হন। তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গবাসী। প্রভু সন্ন্যাস লইবার পূর্বে গার্হস্থ্য জীবনে একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী, পদ্মা পারও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ভ্রমণের বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই ভ্রমণ কালে তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। মিশ্র মুমুক্ষু গৃহী ছিলেন। সাধনতত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায়ে সে সময়ে প্রভুর শরণাপন্ন হন এবং আদিষ্ট হইয়া বারাণসী ধামে বাস করিতে থাকেন। প্রভু বৃন্দাবন পথে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মিশ্রপুত্র রঘুনাথ—বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভট্ট রঘুনাথ নামে বিদিত। রঘুনাথ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসেন এবং আট মাস কাল প্রভুসঙ্গে বাস করেন। বিদায় কালে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"বিবাহ করিও না।"

"বৃদ্ধ পিতা মাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥"

আলিঙ্গন করিয়া প্রভু ভট্টকে বিদায় দিলেন। ভট্ট প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রঘুনাথ কাশীবাস করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতা অভাবে ভট্ট পুনরায় প্রভুর চরণে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে বাস করিবার আদেশ দিলেন।

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাহা যাইয়া রহ রূপ সনাতন স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবে কৃপা কৃষ্ণ ভগবান॥"

প্রভুর আশীর্বাদে ভট্ট উত্তর কালে ভাগবত পাঠের কেমন অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে—

"ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন।"
অশ্রু, কম্প, গদগদ্ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥
গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন॥
গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ কথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥"

প্রভু পূর্ব্বে নবদ্বীপবাসী ভাগবত-পাঠক দেবানন্দকে কেমন করিয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। এইবার ভট্টের দ্বারা দেখাইলেন—ভাগবত পাঠের অধিকারী কে এবং কিরূপেই বা পাঠ করিতে হয়।

মহাপ্রভুর অন্তলীলার বিরহোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে অবস্থা জীবের ধারণার অতীত। যাহার ধারণা হইতে পারে না, তাহা বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' বলিতেছেন—

"প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥"

আমরা চরিতামৃতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি মাত্র। চরিতামৃত অমৃতের খনি। তাহা হইতে অমৃতে ভরা রত্নখণ্ড আহরণ করা ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্তলীলার এই অবস্থা বুঝাইবার শক্তি বা সাধ্য নাই। কৃষ্ণ মথুরা গেলে বিরহকাতরা গোপীগণের যে দশা হইয়াছিল, কৃষ্ণবিচ্ছেদে মহাপ্রভুরও সেই দশা উপস্থিত।

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে।"

উদ্ধব মথুরা হইতে গোকুলে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধিকা যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, প্রভুও তদ্রূপ বিলাপ ও ক্রন্দনে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি প্রায়শঃই রাধিকার ভাবে বিভাবিত থাকিতেন। বৈষ্ণবধর্মের রাধাভাব বড় জটিল। অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ধারণা করিতে পারিলেও রাধিকার ভজন গ্রহণ করিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক। অথচ অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি, দুগ্ধের যেমন ধবলত্ব বাদ দিয়া চিন্তা করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতেও রাধিকার চিন্তা মনে উদিত না হইয়া পারে না। যে তিন শক্তির সমবায়ে ভগবানের পূর্ণতা, তাহার কোনটি বাদ দিলে পরিপূর্ণ ভগবৎ সত্তার ধারণা বা বিকাশ সম্ভবপর নহে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে হ্লাদিনী বা আনন্দময়ী শক্তি অন্যতমা—প্রধানতমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগতের সকল আনন্দের উৎস-আধার স্বয়ং শ্রীভগবান। তাঁহার হ্লাদিনী

শক্তি হইতেই সমস্ত আনন্দ ক্ষরিত হইয়া জগৎকে আনন্দময় করে, জগতের বিচ্ছিন্ন আনন্দ সত্তার ঘনীভূত জমাট শক্তিই লীলার শ্রীরাধিকা। ভগবানের প্রেম বা আনন্দশক্তিই রাধিকা। চৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী"। ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভেদ। শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে হইলে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির চিন্তা মনে যুগপৎ আনিতেই হইবে। প্রভু অহর্নিশি রাধাভাবে বিভোর। একদিন প্রভু স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দেখিতেছেন—

ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥
মণ্ডলী বন্ধে গোপিগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে পাইয়াছেন. প্রভু স্বপ্নে সেই আনন্দে মগ্ন—বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং স্বপ্ন জ্ঞান হওয়াতে জাগ্রত হইয়া বড় ম্রিয়মাণ হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে গড়ুর স্তম্ভ হইতে প্রতি দিবস জগন্নাথদেব দর্শন করিতেন—কখনও অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ লোক একাগ্রচিত্তে দর্শন করিত। একদিন উৎকলবাসিনী এক রমণী লোকের ভিড়ে দর্শনে অসমর্থ হইয়া গড়ুর স্তম্ভে আরোহণ করতঃ প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথদেব দর্শন করিতেছিল। বলা বাহুল্য, রমণী একেবারে তন্ময়—বাহ্যজ্ঞানবিহীনা—নতুবা প্রভুর স্কন্ধে পদস্থাপন করা কোন প্রকৃতিস্থ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। গোবিন্দ রমণীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সাবধান করিতে উদ্যত হইলে প্রভু বলিলেন—"গোবিন্দ নিবারণ করিও না। আহা, স্বচ্ছন্দে রমণী দর্শন করুক।" এদিকে রমণী বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তিমাত্র আর্তনাদ করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—"এই নারীর মত অনুরাগ জগন্নাথ আমাকে দেন নাই।"

"জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো, ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥"

প্রভুর মন নানা ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত। মুহূর্তে মুহূর্তে ভাববিপর্যয় এবং তৎসঙ্গে তাঁহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। স্বপ্নে

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন জ্ঞানে আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে আবার বিষাদ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইলেন। প্রভু ভূমির উপর নিজ নখ দ্বারা কি আঁকিতেছেন—আর অশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া নয়ন-পল্লব রুদ্ধ করিতেছে। কখনও উন্মত্তের ন্যায় গান ও নৃত্য, কখনও বা স্বরূপ রামানন্দ সনে সমস্ত রজনী বিলাপে কাটাইতেছেন।

"প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ স্মরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদ ধর্ম্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥"

কৃষ্ণবিরহে গোপীর যে দশা হইত, প্রভুও সেই সকল দশায় দিন কাটাইতেছেন। কখন কোন্ দশার স্ফূর্তি হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। প্রভুর দেহ-মন ভাব-সমুদ্রের উচ্ছলিত অনন্ত বীচিমালার উপর নিত্য ক্রীড়াশীল—কখনও সে ভাব-লহরী তাঁহাকে উপরে ভাসাইয়া সর্ব অঙ্গে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছে—কখনও বা অতল বারিধিনীরে নিমজ্জিত করিয়া বাহিক বিকাশ একেবারে নিরোধ করিতেছে—কখনও প্রভু প্রগল্ভা বালিকার ন্যায় মুখর—কখনও বা রুদ্ধবাক্ যোগীর ন্যায় শুদ্ধ ও মৌনী। রাত্রিতে কখনও রায় ভাগবতের শ্লোক পড়েন—কখনও বা স্বরূপ কৃষ্ণলীলা গান করেন, আর প্রভু আনন্দে বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়া দেন। এক দিবস এইরূপ অর্ধ রাত্রি যাপন হইলে রায় তাঁহাকে নিজ প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ বহির্দ্বারেই শয়ন করিতেন।

প্রভু উচ্চ সংকীর্তন করিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পর তাঁহারা আর কোন শুনিতে না পাইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, গম্ভীরার তিন দ্বারে অর্গলবদ্ধ কিন্তু তিনি গৃহে নাই। ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া সেই গভীর রজনীতে প্রভু অন্বেষণে ছুটিলেন এবং সিংহদ্বারের উত্তর দিকে এক স্থান তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু অচেতন। নাসায় শ্বাস নাই। একেক হস্ত পদ তিন তিন হাত দীর্ঘ। অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, কেবল চর্মসংযুক্ত। নয়ন উত্তান। মুখে লালা, ফেন। নিশীথরাত্রিতে জনমানবহীন রাজপথে তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইয়া ভক্তগণের মন বিষাদে খিন্ন

হইল। স্বরূপ প্রভুকর্ণে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নাম মহাপ্রভুর মন্ত্রৌষধি। হৃদয়ে সে নাম স্পর্শ করা মাত্র "হরিবোল বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিলা"। প্রভুর চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অস্থি-গ্রন্থি সব জোড়া লাগিল এবং শরীর পূর্ব আকার ধারণ করিল। লীলার স্থানে স্থানে প্রভুর অবয়বের এই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রভু চেতনা পাইয়া বিস্মিত হইলেন। সেই অসময়ে কেমন করিয়া তথায় গেলেন, কিছুই স্মরণ হইল না।

"প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার।
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান॥"

একদিন প্রভু সমুদ্রপথে আচম্বিতে চটক পর্বত দেখিতে পাইলেন; আর গোবর্ধন ভ্রমে পর্বতের প্রতি ধাবিত হইলেন। গোবর্ধনের স্তব পাঠ করিতে করিতে বায়ুবেগে চলিয়াছেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ পাশ্চাৎ ছুটিলেন। চতুর্দিকে মহা কোলাহল হইল। যে স্থানে যিনি যে ভাবে ছিলেন, তিনি সেই ভাবেই প্রভুর উদ্দেশ্য ছুটিলেন—স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান আচার্য প্রভৃতি সকল ভক্তই ব্যাকুল—সকলেই সিন্ধুতীরে উপস্থিত। এদিকে প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পতিত হইয়াছেন—সংজ্ঞাহীন; যে অবস্থা হইল, তাহা মানুষের দুর্বল লেখনী আর কি ব্যক্ত করিবে!

"প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার॥
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার।
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার॥
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

গোবিন্দ করঙ্গের জলে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন করিয়া বহির্বাস দ্বারা চারু অঙ্গ ব্যজন করিতেছেন। প্রভুর শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব একযোগে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তগণ তাঁহার অবস্থা দৃষ্টে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সকলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চ সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ কীর্তনের পর "হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে"।

"আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥"

মহাপ্রভু বিস্মিত হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণকে সে অবস্থায় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্তি হইলে তিনি স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥

আমি এখান হইতে আজ গোবর্ধনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম—কৃষ্ণ গোবর্ধনে গোধন চড়াইতেছেন। গোবর্ধনের চতুর্দিকে ধেনুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কৃষ্ণ বেণুনাদ করিলেন আর সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া রাধাঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তোমরা কোলাহল কবিয়া আমাকে লীলা দেখিতে দিলে না।" এই বলিয়া মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণও প্রভুর দশা দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। এমন সময় পুরী, ভাবতী, সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাবা উভয়ই মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয়। প্রভু তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমে বন্দনা কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দোঁহে কেন আইলা এতদূবে।
পুরী গোসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥"

উত্তরে প্রভু লজ্জিত হইলেন। অতঃপব সকলে সমুদ্র স্নান কবিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রভু কৃষ্ণভাবাবেশে রাত্রি দিন যাপন করিতেছেন। তিনি জগন্নাথদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই দেখেন—কৃষ্ণকান্তির পরম মাধুর্যে মগ্ন হইয়া থাকেন। কাজেই দর্শন ছাড়িয়া আসিতে চান না। স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ নানা সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়া স্নানাহাব করান। প্রভু কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা শ্রীমতীর ভাবে স্বরূপ রামানন্দ সহ রাত্রি দিন বিলাপ করিতেন। তাঁহারাও উভয়ে কখনও কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি বা গীতগোবিন্দেব মধুর পদ পাঠ ও গান করিয়া প্রভুকে আনন্দ দিতেন। একদিন প্রভু সমুদ্র যাইতে হঠাৎ এক পুষ্পোদ্যান দেখিয়া বৃন্দাবন ভ্রমে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাস হইতে সহসা অন্তর্ধান করিলে কৃষ্ণগত প্রাণা গোপীগণ যেমন করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া পাতি পাতি অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুও গোপীভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপ খুঁজিতেছেন। ভাগবতের সেই সব মধুবর্ষী শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি প্রতি তরুলতার পাশে প্রেমময়ের অনুসন্ধান করিতেছেন—

"চূত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিদার
জম্বর্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

* * * *

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥"

প্রভু যমুনাতীরস্থ বিল্ব-বকুল-নীপ প্রভৃতি বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ এই দিকেই আসিয়াছেন, তোমরা কি দেখিয়াছ? আবার মনে ভাবিতেছেন, এই সব বৃক্ষ পুরুষ জাতি, শ্রীকৃষ্ণের সখা—ইহারা তাঁহার তত্ত্ব আমাকে কেন বলিবে? এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ার পরক্ষণেই তুলসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি—তুমি কি অচ্যুতকে দেখিয়াছ? আবার মালতী প্রভৃতি লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"মালত্যদর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥"

হে মালতী, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, মাধব কি তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন?"

তুমি সব হও আমার সখির সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশে কহি সবে রাখহ পরাণ ॥

উত্তর না পাইয়া ভাবিতেছেন, "ইহারা কৃষ্ণদাসী, ভয়ে কেহ আমাকে সন্ধান বলিতেছে না।" কোন স্থানে বা ফলপুষ্পভরে অবনত বৃক্ষগণকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, "কৃষ্ণ এই পথেই গিয়াছেন; তাই বৃক্ষগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নতশীর্ষে রহিয়াছে।" তাহাদের নিকট গিয়া কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। উত্তর না পাইয়া ভাবিতেছেন, ইহারা সকলেই কৃষ্ণবিরহদুঃখে মূক—কে উত্তর দিবে? প্রভু দ্রুতপদে যমুনার কুল প্রতি ধাবিত হইলেন—দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বৃন্দাবনে পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন, কাজেই কালিন্দী-তট অতি সন্নিকট, তাই আবিষ্ট হইয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ যমুনাকুলে কদম্বতলে দেখিলেন—

"কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগত নেত্র মন॥"

দর্শন মাত্রই প্রেমে মূর্ছিত হইলেন—স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া নানা সন্তর্পণে প্রভুকে চেতন করাইলেন। প্রভু উঠিয়া চতুর্দিকে দেখিতেছেন—

কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দরশন।
যাহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র মন॥

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে যে শ্লোক পড়িয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, প্রভু সেই শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"আমি কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিয়াছি, দুর্দৈববশতঃ আবার হারাইলাম।" পরে আর্দ্রকণ্ঠে স্বরূপকে বলিলেন—"স্বরূপ, একটি শ্লোক পড়, যাহাতে আমার চিত্ত কিছু স্থির হয়। স্বরূপ গীতগোবিন্দের মধুর পদ ধরিলেন—

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসম্॥"

আর প্রভু আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন—অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব হইল—

"বোল বোল বলি প্রভু কহে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর॥
বোল বোল প্রভু বলে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি॥"

এই ত প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা—প্রভু একেবারে প্রেমোন্মত্ত—প্রভু দেহ ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন—ভক্তগণকে ভুলিয়াছেন—নীলাচল ভুলিয়াছেন—জগৎ ভুলিয়াছেন। প্রভুর বাহ্যিক কোন জ্ঞান নাই—ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল—অহর্নিশি তন্ময়চিত্তে কেবল ভাবরাজ্যে বিচরণ।

ভগবান প্রেমময়। এই প্রেম যে কি বস্তু, তাহা জীবের ধারণা হইতে পারে না। ভগবৎ প্রেম লাভ করা বুঝি জীবের সাধ্যায়ত্তও নয়, ইহা নিত্য সিদ্ধ—সাধনা দ্বারা লাভ করা যায় না। এই প্রেম একবার যমুনাকূলে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি মহাভাব-স্বরূপিনী স্বয়ং শ্রীরাধিকা জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন—আর দ্বিতীয়বার দেখাইলেন, প্রেমাবতার স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু। এই প্রেম আস্বাদন করিতে বা জীবকে তা'র স্বরূপ দেখাইবার অধিকারী আর কেহ হন নাই। মহাপ্রভু নিজে আসিয়া ইহা না দেখাইলে জীবের ইহা দেখিবার বা বুঝিবার অন্য উপায় ছিল না। তাই গৌরভক্ত ভাববিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

যদি গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥

মহাপ্রভুর ভগবত্তায় সন্দিহান বিজ্ঞ পাঠক একবার সমাহিতচিত্তে প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা চিন্তা করিবেন, সকল সন্দেহ মুহূর্তে দূর হইয়া প্রভুর স্বরূপ নির্মল মানসপটে ফুল্ল জ্যোৎস্না-লেখাবৎ আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের দুর্বল লেখনার যুক্তি-তর্কের কোনই প্রয়োজন হইবে না।

১৯

আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা 'চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে সেই মহাগ্রন্থের ক্রমানুসারে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর এই অবস্থা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।

"লোকে নাহি দেখে য়েছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি ॥"

চরিতামৃত যে অপূর্ব মাধুর্য রসে সিক্ত করিয়া প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই মনে হয়—এই ভাব, এই ভাষা মানব জ্ঞান-বুদ্ধি প্রসূত নহে। মহাপ্রভুর কৃপায় দিব্য জ্ঞানের বিকাশ না হইলে এমন বর্ণনা হইতে পারে না। আমরা স্থানে স্থানে শ্লোকগুলি আমূল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন যেন মধুক্ষরণ হইতেছে। গোবিন্দলীলামৃত হইতে শ্রীরাধিকার শ্লোক পড়িয়া প্রভু বিলাপ করিতেছেন, চরিতামৃত অনিন্দ্য দেবভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—

নব ঘন স্নিগ্ধ বর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ হরে সবার নেত্র মন,
কৃষ্ণ কান্তি পরম প্রবল।
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়।

সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা উপরে দিয়াছে দেখা
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি মধুর গর্জ্জন শুনি
বৃন্দাবনে নাচে ময়রচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণ কল লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল
চিত্তচন্দ্র তাহাতে উদয়॥

এই সময় গৌড়ীয় ভক্তগণের আবার নীলাচলে আগমন হইল। এবারে ভক্তগণ সঙ্গে কালিদাস নামে এক সাধু বৈষ্ণব প্রভুর দর্শনার্থ পুরীধামে আসিয়াছেন।

"মহাভাগবত তেঁহো সবল উদার।"

কালিদাস তাঁহার দৈনিক সকল কার্যের সহিত কৃষ্ণনাম জড়াইয়া রাখিতেন। নামসাধক কালিদাসের এক মুহূর্তের জন্যও নামে বিরতি ছিল না।

"কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি পাশক চালায়॥"

কালিদাসের সাধনার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি জাতি নির্বিশেষে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রাদি বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট ভোজ্য সাদরে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেন। এক দিবস কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর নামে ভুঁইমালি জাতীয় এক বৈষ্ণব ভক্তকে আম্রফল ভেট দিতে গিয়াছিলেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে অতিথি পাইয়া মধুর বচনে আপ্যায়িত করিলেন। কালিদাস আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—

"পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥"

বৈষ্ণব ঠাকুর ইহাতে নিতান্ত মর্মাহত হইয়া বলিলেন—

"ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচ জাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥"

বৈষ্ণব ভক্ত সাধন-জগতে, যত উচ্চেই আরোহণ করুন না কেন, "তৃণাদপি সুনীচেন"—এই দীনতা সকলের মধ্যেই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত। উত্তর শুনিয়া কালিদাস ভাগবতের শ্লোক পড়িলেন—

"অহো বত শ্বপচতো গরীয়ান।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্॥"*

ঠাকুর বলিলেন—"ঠিক কথা, এই তো শাস্ত্র, যাহাতে কৃষ্ণভক্তি আছে তিনি কখনই নীচ নহেন কিন্তু আমাতে তো ভক্তি নাই।"

অতঃপর কালিদাস তাহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। পরে ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তৎত্যক্ত চর্বিত আম্রফল বাহিরের উচ্ছিষ্ট গর্ত হইতে লইয়া চুষিতে লাগিলেন। আর—

"চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস।"

কালিদাস নীলাচলে আসিয়া প্রভুর মহাকৃপা লাভ করিলেন। ভক্তসেবাপরায়ণ দীন কালিদাসের সাধন রহস্য প্রভুর অজ্ঞাত ছিল না। প্রভু প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলে গোবিন্দ জলকরঙ্গ লইয়া তাহার অনুগামী হইতেন। পরে প্রত্যহ পদপ্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ালে এক নিম্ন গর্ত ছিল। প্রভু সেই গর্তে প্রতি দিবস পদ ধৌত করিতেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে বিশেষ অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন— এই পদজল যেন কেহ না লয়।

'প্রাণিমাত্র না পায় লইতে সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥'

একদিন পদপ্রক্ষালন কালে কালিদাস আসিয়া হাত পাতিলেন এবং ক্রমে তিন অঞ্জলি চরণামৃত ভক্তিভরে পান করিলেন। কালিদাস বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণরূপ নীচ সেবার দ্বারাই প্রভুর এত কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালিদাসের আখ্যান হইতে চরিতামৃত সাধন-জগতের এক মুখ্য সূত্র অবতারণ করিয়া বলিতেছেন—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ, এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥"

* "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ। ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃহ্নতি যে তে॥"

ভক্তসঙ্গের মহিমা অনন্ত। ভক্তি লাভের একমাত্র উপায় ভক্তসঙ্গ। ভক্তই ভগবানকে জানিয়াছেন—ভক্তের মধ্যেই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। ভক্তসঙ্গ যেমন ভক্তিলাভের এক প্রধান উপায়, ভক্ত-পদধূলি—ভক্ত-পদজলও তদ্রূপ শক্তিশালী। এই পদধূলি বা পদজল—সাধারণ ধূলিকণা বা জলবিন্দু নয়—তাহা ভগবৎভক্তের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে পরম পবিত্র ও মহাশক্তিসম্পন্ন। ভক্তের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত, ভক্তপদধূলি বা জলেও সেই শক্তিই সঞ্চাত। মলিন মন শোধন করিতে তাহা মহৌষধি। মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাদান কালে বলিতেছেন— "কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধু সঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥"

কাজেই দেখা যাইতেছে, সাধুসঙ্গ লাভ বড় সহজ নয়। যতদিন পর্যন্ত মন বিষয়ে আসক্ত থাকিবে—বৈরাগ্যের ভাব যতদিন অন্তঃকরণে ফুটিয়া না উঠিবে—ততদিন ভক্তসঙ্গ লাভের আশা করা সুদূরপরাহত। মানব যখন বিষয়ে ক্রমে উদাসীন হইয়া পরমার্থ চিন্তার জন্য প্রস্তুত হইবে - তখনই কেবল এই দুর্লভ ভক্তসঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সাধুসঙ্গ মানব জীবনে কখনও হঠাৎ বা অতর্কিতভাবে উপস্থিত হয় না। ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মত মনের ক্রমিক বিকাশানুসারে তাহা লাভ হইয়া থাকে। জড় ও চেতন একই সুশৃঙ্খল বিধি নিয়মের অধীন। ক্রমোন্নতিই উভয় জগতের মূল রহস্য। জীবনে ভক্তসঙ্গ লাভ হইল না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা সাময়িক ব্যাকুলতাও প্রকাশ করেন। কিন্তু জীবনের এই মহাদান মানসিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের যখন সেই অবস্থা আসিবে—ভগবানের অমোঘ বিধানানুসারে সাধুসঙ্গ লাভ তখন অনিবার্য। ইহা স্বকৃত চেষ্টা বা যত্ন সাপেক্ষ নহে। বিষয়াসক্ত অপরিপক্ক মন অকালে ভক্তসঙ্গ লাভ করিলে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিষয়-মলিন মন ভক্ত-জীবনের পবিত্র ধর্ম গ্রহণে অপারগ। এইজন্যই প্রভু বলিলেন—যখন "সংসার ক্ষয়োন্মুখ" হয় অর্থাৎ বিষয়াসক্তির প্রবলতা যখন মন্দীভূত—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পরিজনের বন্ধন যখন শিথিল হয় তখনই কেবল মানবের সাধুসঙ্গ লাভের সময় হয়—তৎপূর্বে নয়। সাধুসঙ্গ দ্বারা ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমে সুদুর্লভ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সংসারাসক্তি দূর না হইলে কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারে না। দুই দিক এক সঙ্গে বজায় থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুই বস্তুর একত্র সমাবশ প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। প্রভু আরও বলিতেছেন—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
নবমন্ত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥"

এ যাত্রার গৌড়ীয় ভক্তগণের অভিযানে শিবানন্দ সেন সদারাপত্য প্রভু দর্শনে আসিয়াছেন। শিবানন্দের এই পুত্রটির নাম প্রভুর অভিপ্রায় মত "পুরীদাস" রাখা হইয়াছিল। শিবানন্দ পুত্র সঙ্গে প্রভুচরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু বালককে বলিলেন, "কৃষ্ণ কহ।" কিন্তু বালক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিল না। শিবানন্দ বহু যত্নেও পুত্রকে কৃষ্ণ নাম বলাইতে পারিলেন না। প্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"—আমি নাম জগৎ লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইল ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণ নাম কহাইতে ॥"

স্বরূপ বলিলেন—"প্রভু, আমার অনুমান হয়, তোমার দত্ত কৃষ্ণনাম মন্ত্র বালক মনে মনে জপ করিতেছে—কাহারও সম্মুখে মন্ত্র প্রকাশ করিতেছে না।"

অপর এক দিবস প্রভু বলিলেন—"পুরীদাস পড়"। আর সপ্তম বর্ষীয় বালক ভক্তগণকে চমৎকৃত করিয়া শ্লোক পড়িল—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্র মণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥"

(যিনি নীলকমল তুল্য নয়ন-প্রীতিকর অঞ্জন ও কজ্জলবৎ শোভনকর ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত মোহনমালায় বক্ষঃ শোভনকারী এবং বৃন্দাবন-রমণীগণের অলঙ্কারস্বরূপ—সেই হরি জয়যুক্ত হউন)।

"সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥"

ভক্তগণ পূর্ববৎ চারি মাস নীলাচলে বাস করিয়া দেশে গমন করিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান ছিল—তাঁহাদের অদর্শনে পুনরায় সেই প্রেমোন্মাদ অবস্থা আরম্ভ হইল। এক দিন জগন্নাথ-সেবকগণ ভোগ অন্তে মহাপ্রসাদ প্রভুর হস্তে প্রদান করিলেন। প্রভু প্রসাদকণা জিহ্বায় স্পর্শ করা মাত্রেই তাহার অপূর্ব স্বাদ ও সৌরভে আকুলিত হইলেন।

"কোটি অমৃত স্বাদ পাইয়া প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥"

প্রভু প্রসাদ গোবিন্দের অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিলেন। প্রভু মনে মনে বিচার

করিতেছেন—যে জিনিসে এই প্রসাদ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সমস্তই প্রাকৃত—প্রাকৃত বস্তুতে অমৃতোপম এত স্বাদ, এত সৌরভ কখনই আসিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সংস্পর্শ হইয়াছে। এই চিন্তা করিতেই প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং বার বার "সুকৃতিলভ্য ফেলামৃত" বলিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান॥"

প্রভুর অন্তরে কেবল কৃষ্ণাধরামৃতের কথাই উদিত হইতেছে—প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া প্রভু নিজ বাসায় আগমন করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সকল ভক্তকে সেই অপূর্ব প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন।

"প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥"

প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃত প্রসাদে এই লোকাতীত আস্বাদ ও গন্ধ পাইতেছি। এই প্রসাদে কৃষ্ণাধরের সমস্ত গুণের সঞ্চার হইয়াছে।"

মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ।

ভক্তগণ মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদ আস্বাদ করিতেই সকলে প্রেমে মত্ত হইলেন। রায় রামানন্দ প্রভুর আদেশানুসারে ভাগবত হইতে নানা শ্লোক পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

২০

এক দিবস প্রভু, স্বরূপ রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অর্দ্ধ রাত্রি কাটাইলেন। তাঁহারা গৃহে গমন করিলে প্রভু একাকী উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে অবশিষ্ট রজনী কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে নিশা যাপন প্রতি দিবসই হইত। এমন সময় আচম্বিতে কৃষ্ণ বেণুগান শ্রবণে প্রভু তন্ময় হইয়া সেই গীত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া আছেন—কক্ষের তিন দ্বারই রুদ্ধ—কিন্তু প্রভু বাহির হইয়া গেলেন। গোবিন্দ সর্বদাই সচকিত থাকিতেন। প্রভু কোথায় যান, কি করেন, তাহার জন্য তিনি সর্বদাই সন্ত্রস্ত। প্রভুর সহিত গোবিন্দকেও প্রায় সমস্ত রজনী বিনিদ্র কাটাইতে হইত। গোবিন্দ

ক্ষণকালের জন্য তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ জাগরিত হইয়া প্রভুর কীর্তন শুনিতে না পাইয়া স্বরূপকে আহ্বান করিলেন। ভক্তগণের সঙ্গে স্বরূপ প্রদীপ হস্তে প্রভুকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গ গাভীগণের মধ্যে তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণ দেখিলেন—"প্রভুর মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ—নেত্রে অশ্রুধার।"

"অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥"

গাভীগণ চতুর্দিক ঘিরিয়া প্রভু অঙ্গ আঘ্রাণ করিতেছে—দূর করিলেও অঙ্গ সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে না। সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করাতে বহুক্ষণ পর প্রভু চেতনা পাইয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে তুমি কোথায় আনিয়াছ? আমি যে বেণুগান শুনিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম।"

"দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

বেণু ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার কুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। তাঁহার ভূষণ ধ্বনিতে আমাকে বধির করিয়াছিল। কৃষ্ণসহ গোপীগণের হাস-পরিহাস, তাঁহাদের কলকণ্ঠের মধুর ধ্বনিতে আমি এতক্ষণ উল্লাসে মগ্ন ছিলাম। তোমরা কোলাহল করিয়া আমাকে সে লীলা দর্শনে বঞ্চিত করিলে—আমি সে অমৃতের বাণী—ভূষণ, মুরলীর সুমধুর ধ্বনি আর শুনিতে পাইলাম না।

"হা হা সখি কি করি উপায়।
কাঁহা করেঁ। কাঁহা যাও, যাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মন নেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণ তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কাঁহা তাহা যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল নিয়া॥"

'চরিতামৃত' বলিয়াছেন—

"একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন॥

*   *   *   *

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥"

প্রভু দিন যামিনী কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসমান। শরৎকাল। মেঘনির্মুক্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে ধরা প্লাবিত। শুভ্রোজ্জ্বল কিরণালোকে জগৎ স্নাত ও হাস্যময়। এই মধুর জ্যোৎস্নালোকে প্রভু আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। কখনও বা রাসলীলার গীত শুনিতেছেন—কখনও বা নিজেই গাহিতেছেন—কখনও বা নৃত্য করিতেছেন—কখনও বা প্রেমাবেশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন—আবার কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ সমুদ্র দর্শন করিলেন—

"চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥"

দর্শন মাত্র প্রভু যমুনা ভ্রমে ধাবিত হইয়া সকলের অলক্ষিতে সিন্ধু নীরে ঝাঁপ দিলেন। সমুদ্রতরঙ্গ প্রভুকে শুধু কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় একবার ডুবাইতেছে আবার উপরে তুলিতেছে। যমুনাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ জলকেলি করিতেছেন—প্রভু এই রঙ্গে মগ্ন হইয়া সমুদ্রে ভাসিতেছেন। প্রভু সকলের অলক্ষিতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিয়া চমকিত হইলেন—প্রভু কোন দিকে ধাবিত হইলেন, কেহ বলিতে পারিলেন না। প্রভু মহাবেগে অগ্রসর হইয়াছেন—কেহ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। সকলের মনে এক দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল।

"জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে কিবা কিবা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে॥"*

* পুরীর নিকটবর্ত্তী সাগরকূলে।

ব্যাকুল হইয়া ভক্তগণ প্রভুকে খুঁজিতেছেন—কেহ কেহ সমুদ্রতীরে আসিয়াছেন। এদিকে রজনী প্রভাতকল্পা—কিন্তু প্রভুর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ আর্তনাদ করিয়া প্রভুকে অনুসন্ধান করিতেছেন। ভক্তগণের দেহে প্রাণ নাই। তবে কি প্রভু মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অন্তর্ধান করিলেন—এই আশঙ্কা অন্তঃকরণে উদিত হওয়া মাত্রেই সকলে শিহরিয়া উঠিতেছেন।

"সিন্ধু তীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ।
বিষাদে বিহ্বল সব নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।"

স্বরূপ গোঁসাই কতিপয় ভক্ত সঙ্গে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—

"এক জালিয়া আসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলি হরি হরি॥"

স্বরূপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, তোমার এ দশা হইল কেন?"

সরল মৎস্যজীবী বলিল—"আজ জাল বাহিতে এক মৃত আমার জালে আসিয়াছে। বৃহৎ মৎস্য বলিয়া আমি তাহাকে কূলে উঠাইলাম—

"জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল॥"

ধীবর বলিতে লাগিল—"এই শবের শরীর পাচ-সাত হাত দীর্ঘ, তিন তিন হাত এক এক হস্ত, নয়ন উত্তান, কখনও গাঁ গাঁ করিতেছে, কখনও বা অচেতন হইতেছে। একি ভূত না ব্রহ্মদৈত্য বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমাকে ভূতেই পাইয়া থাকে আমার কি উপায় হইবে? আমি নৃসিংহ নাম স্মরণ করিয়া সারারাত্রি নির্জনে মৎস্য ধরিয়া থাকি, কখনও ভয় আমাকে অভিভূত করিতে পারে না। আব এই ভূত নৃসিংহ নামে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়।" ধীবর ভক্তগণকে বলিল—"ঐদিকে আর অগ্রসর হইও না। আর অগ্রসর হইলে সকলের দশাই আমার মত হইবে।" বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শে ভাগ্যবান মৎস্যজীবীর জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবশে দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। অশ্রু, কম্প প্রভৃতি ভাব-সম্পদ তাহারই আনুষঙ্গিক ফল। ধীবর তাই

আত্মবিস্মৃত হইয়া "হরি, হরি" বলিয়া নাচিতেছে। মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শ তো দূরের কথা, তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই জীবের মলিন জিহ্বায় হরিনাম ফুটিয়া উঠিত। সন্ন্যাস লইয়া প্রভুর শান্তিপুরের পথে বিচরণ কালে তাঁহার প্রেম-কান্তি দর্শন মাত্রেই রাখাল বালকগণের মুখে হরিনাম উচ্চারণে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ দূর হইতে হস্তীর উপরে থাকিয়া প্রভুকে দর্শনমাত্র "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই আখ্যান বর্ণনকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—

"এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ প্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥"

ধীবরের কাহিনী শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাই সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুলকিত হইয়া বলিলেন—"দেখ, আমি একজন ওঝা, ভূত ছাড়াইতে পারি"। বলিতে বলিতে মন্ত্র পড়িয়া শ্রীহস্ত তাহার মস্তকে অর্পণ করিলেন, এবং

"তিন চাপড় মারিয়া কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইও বলি সুস্থির করিল॥"

ধীবরের দৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। তাহার বিশ্বাসানুযায়ী প্রচলিত মন্ত্রাদিযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ভূত ছাড়িয়াছে, এই জ্ঞান না হইলে কার্যোদ্ধার হইবে না বিবেচনায় স্বরূপ গোঁসাই ভূতের মন্ত্রই পড়িলেন। ভয় দূর হওয়াতে ধীবর ক্রমে সুস্থির হইল। স্বরূপ তখন তাহাকে আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ—

"ভূত নহে তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।"

প্রেমাবেশে তিনি আজ সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন—ভাগ্যবান তুমি মহাপুণ্যে তাঁহাকে জালে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শে তোমার দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে। এখন তোমার ভয় দূর হইয়াছে, প্রভুকে কোথায় উঠাইয়াছ আমাকে দেখাও।" জালিয়া কিন্তু তবু সন্দিগ্ধচিত্ত। সে বলিল—"এ প্রভু নয়, আমি তো প্রভুকে অনেক বার দেখিয়াছি। ইহার আকার অতি বিকৃত। স্বরূপ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—"প্রভুর শরীর প্রেম-বিকারে অস্থি সন্ধি ভগ্ন হইয়া এইরূপ দীর্ঘাকারই হইয়া থাকে। প্রভুই বটে—কোন সন্দেহ নাই, তুমি আমাদিগকে লইয়া চল।" জালিয়া তখন মহানন্দে সকলকে পথ দেখাইয়া চলিল। ভক্তগণ দেখিলেন প্রভু অচেতন হইয়া সমুদ্রের বালুতটে পড়িয়া আছেন।

"জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়।"

তনু অতি দীর্ঘ—শিথিল হইয়াছে। ভক্তগণ প্রভুর আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইলেন। দেহ হইতে বালু ঝাড়িয়া শয়ন করাইলেন এবং সকলে গভীর নাদে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। শত কণ্ঠে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম ধ্বনি আকাশ পাতাল ছাইয়া ফেলিল।

"কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥"

প্রভু ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥"

আমি তীরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম—

"পট্টবস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া সখি-কর
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লইয়া কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন
জলকেলি রচিল সুঠাম।
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে
কৃষ্ণ মত করিবর চঞ্চল কর পুষ্কর
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে॥"

বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা আমাকে এখানে আনিলে কেন?" স্বরূপ তখন সমুদ্র পতন হইতে আরম্ভ করিয়া জালিয়া ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অতঃপর ভক্তগণ মহানন্দে স্নানাদি সমাপণ করিয়া প্রভুকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন।

প্রতি বৎসরই পণ্ডিত জগদানন্দ শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিতে মহাপ্রভুর সংবাদ লইয়া নবদ্বীপ আসিতেন এবং নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রভুর বারতা জ্ঞাপন করিয়া সকলকে উৎফুল্ল করিতেন। জগদানন্দ এবারও নবদ্বীপ আসিয়া পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় আচার্যাদি ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। আচর্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভুকে এক তরজা বলিয়া পাঠাইলেন। এই তরজা বা হেঁয়ালীর সঠিক অর্থ উদ্ধার করা বড় দুরূহ। প্রভু ভিন্ন অপরে তরজা শুনিলেও যাহাতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আচার্য ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্বোধ্য তরজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য-কৃত এই তরজা অনেকে অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত যে, তরজার দ্বারা মহাপ্রভুর লীলা যে অবসানপ্রায়, যে মহান্ উদ্দেশ্যে তাঁহার এবং তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের ধরাতলে আবির্ভাব—তাহা যে সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং লীলাশেষে তাঁহাদের যে তিরোধানের সময় উপস্থিত, তরজা প্রচ্ছন্নভাবে এই বিষাদ-কাহিনীই প্রকাশ করিয়াছিল। পণ্ডিত-শিরোমণি স্বরূপও তরজার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু যে উত্তর দিলেন, তাহাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। তরজার অর্থ প্রকাশ না করিয়া প্রভু বলিলেন—

"আচার্য আগম শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম মত পূজা-অর্চনাদি করিয়া থাকেন—উপাসনাকালে ইষ্টদেবের আবাহন করেন এবং পূজা অন্তে বিসর্জন দেন। কি মনন করিয়া তিনি তরজা করিয়াছেন, আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। আচার্য মহাযোগেশ্বর—তাঁহার ভাব গ্রহণ করা দুরূহ।" প্রকৃত অর্থ প্রভু যে ইচ্ছা করিয়াই বলিলেন না, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। স্বরূপ গোঁসাই তরজা শুনিয়া বিমনা হইলেন। আভাষে তরজার প্রকৃত মর্ম তিনি যে বুঝিতে না পারিলেন, তাহা নহে। বিশদ অর্থ প্রকাশ না করিলেও প্রভু আচার্যের পূজার যে আভাষ দিলেন, তাহাতেই বোধ হইতেছে এই তরজার দ্বারা লীলা অবসানই সূচিত হইয়াছিল। আচার্যই নিত্য তুলসী গঙ্গাজলে কৃষ্ণ পূজা করিয়া তাঁহাকে আবাহন করিয়াছেন—আচার্যের ব্যাকুল আহ্বানেই মহাপ্রভুর অবতার। পূজা অন্তে বিসর্জনের বিষাদ-গীতিও সর্ব প্রথম তিনিই গাহিলেন। তরজাটি এই—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

এই তরজা পাঠের পরদিন হইতেই প্রভুর ভাবাবেশ বিশেষ পরিবর্তিত হইল। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ জ্বালা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রাত্রি দিন কেবল "উন্মাদ, প্রলাপ, চেষ্টা।" কখনও রামানন্দের গলা ধরিয়া প্রভু বিলাপ করিতেছেন, কখনও বা স্বরূপকে নিজ সখি জ্ঞানে রাধিকার ভাবে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ক্ব নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ॥
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি।
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥"

(কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুলা হইয়া শ্রীরাধিকা সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্র কোথায়? সেই ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ কান্তি, রাসরসে নৃত্যশীল, জীবনরক্ষার মহৌষধি আমার অমূল্যনিধি ও সুহৃদ শ্রেষ্ঠ কোথায়? হা বিধি ধিক্ তোমায়!) এই ভাবাবস্থায় এক দিবস অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রভু, স্বরূপ ও রায়সহ কৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়া গম্ভীরায় শয়ন করিলেন। প্রভু বিনিদ্র, প্রেমাবেশে নাম-কীর্তন করিতেছেন। দ্বারে গোবিন্দ নিদ্রিত। হঠাৎ প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া উত্থিত হইলেন এবং বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে দ্বার খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্ধকারে দ্বার না পাইয়া ভিত্তিগাত্রে মুখ ঘষিতে লাগিলেন। প্রভু সমস্ত রজনী এইরূপ উদ্বেগে কাটাইলেন—গম্ভীরার ভিত্তিগাত্রের অবিরাম ঘর্ষণে মুখ, গণ্ড ও নাসিকা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তধারে সর্বাঙ্গ সিক্ত হইল। গোবিন্দ গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া জাগরিত হইলেন এবং দীপ জ্বালিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্বরূপও অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা মর্মাহত হইয়া দেখিলেন—প্রভুর নাসিকা, গণ্ড ও মুখ হইতে রক্তস্রোত বহিতেছে। ব্যথিতচিত্তে স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, এ কি করিয়াছ?"

"প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে॥

দ্বাব নাহি পাইয়া মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয বক্ত পড়ে না পাই যাইতে॥"

ভক্তগণ বড সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাবা প্রভুকে আব একাকী গম্ভীবাব মধ্যে বাখা কখনই নিবাপদ জ্ঞান কবিলেন না। ভক্তগণ অনুনয় কবিযা শঙ্কবকে তাঁহার সঙ্গে শয়নেব ব্যবস্থা করিলেন। শঙ্কব প্রভুর পদতলে শয়ন কবিতেন। শঙ্কর যে পর্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন, প্রভুব পদ সংবাহন কবিতেন, কিন্তু শঙ্কব প্রায়ই নিদ্রাভিভূত হইযা পডিতেন আব প্রভু নিজ গাত্রেব কাঁথা তাহাব গায়ে জডাইয়া দিতেন। শঙ্কব নিদ্রিত হইলেও শীঘ্রই চেতন পাইতেন। কাজেই প্রভু আব বাহিবে যাইবাব চেষ্টা কবিতেন না।

বৈশাখেব এক পৌর্ণমাসী বজনীতে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ দেবেব প্রধান উদ্যানে প্রবেশ কবিলেন। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে উদ্যান ও উদ্যানপথ উৎফুল্ল—আনন্দে ভক্তগণ প্রভুকে লইযা ভ্রমণ কবিতেছেন।

"প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লবী যেন বৃন্দাবন।
শুক, শাবী, পিক, ভৃঙ্গ, কবে আলাপন॥
পুষ্প গন্ধ লইযা বহে মলয পবন।
গুরু হইয়া তরুলতা শিক্ষায নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায পবম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায কবে ঝলমল॥"

স্বরূপ "ললিতলবঙ্গলতা" পদ গাহিতেছেন, আব প্রভু আনন্দে মধুব নৃত্য কবিতেছেন। হঠাৎ প্রভু অশোকতলে শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন এবং দর্শনমাত্র ধাবিত হইলেন। কিন্তু অগ্রসব হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান কবিযাছেন—কেবল কৃষ্ণ অঙ্গেব পবম সৌবভে উদ্যান ভবিযা উঠিযাছে, প্রভু সেই গন্ধে অচেতন হইলেন। চেতনা পাইযা প্রভু গোবিন্দ-লীলামৃত হইতে শ্লোক পডিয়া অর্থ কবিতে লাগিলেন—

"এই মত গৌরহবি গন্ধে কৈল মন চুবি
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা পাশে কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে, সুখ পায
এই মত প্রাতঃকাল হৈল।

স্বরূপ রামানন্দ রায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥

কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বল মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে বাস করিতেছেন। এক এক দিবস এক এক ভাবের শ্লোক পাঠ ও তাহার রস আস্বাদন হইত। কখনও বা সারা নিশি জাগরণ করিয়া প্রভু রায় ও স্বরূপ সনে ভাগবতের শ্লোক আস্বাদন করিতেন। এই সময় এক দিবস প্রভু নাম সাধনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড আশার বাণী—সংসারাসক্ত মলিন মানবেব অমূল্য নিধি।

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলি পরম উপায় ॥
* * *
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥"

এই অবস্থায় কখনও বা নিজকৃত শ্লোক পাঠ কবিতেন—

"যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক।"

এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমবা মহাপ্রভুর নিজকৃত শ্লোক-কয়েকটি ও চরিতামৃতে এই শ্লোকগুলির অপূর্ব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শ্লোকাষ্টক গৌবভক্ত-কণ্ঠমণি। নিত্য এই শ্লোক পাঠ করিলেই ভগবৎভক্তি লাভ হইতে পাবে। মহাপ্রভু-কৃত শ্লোক কেবল যে মধুর হইতে মধুরতর তাহা নহে—শ্লোকেব মধ্যে এক বিরাট শক্তি নিহিত আছে—শত শত বর্ষ পরে এখনও সে শক্তি সমভাবে ক্রিয়াশীল। সংসারের শত ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষুব্ধ মানব দুঃখ-দৈন্যের নিপীড়নে ক্লিষ্ট হইয়া দিনান্তে কর্মক্লান্ত দেহ-মনে একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগত-পাবন নাম লইয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিও। দেখিবে, হৃদয়ে কত বল, কত আশা, কত শান্তি, কত নির্ভরতা আসিয়াছে—তুচ্ছ নীচ সংসার-বাসনা কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে—নিরাশার পুঞ্জীভূত মেঘকালিমা অপসারিত হইয়া জীবন উষার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। চরিতামৃত বলিতেছেন—

"প্রভু অষ্ট শ্লোক শিক্ষা যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণের প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥

ঠিক কথা! গৌরভক্ত ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন।

।। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শ্লোক ।।

১। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ !

২। "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।।"
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ।।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ।।
সর্ব্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ।।

৩। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।"
উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ।।
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয় ।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ।।
সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ।।
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ।।
এই মতে করি যেই কৃষ্ণ নাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ।।

৪। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"
"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥"
৫। "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥"
তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
"নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥"
৭। "যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥"
"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥"
৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

মহাপ্রভু নীলাচলেই অপ্রকট হ'ন। প্রভুর তিরোভাবের কোন বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত কিম্বা মুরারি গুপ্তের "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং" প্রভৃতি গৌরলীলার প্রামাণ্য মহাগ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সব গ্রন্থে এমন আবশ্যকীয় বিষয়ের কেন উল্লেখ নাই, তাহা বলা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করিয়াছেন। লীলার সামান্য-বৃহৎ সমস্ত কাহিনীই সুচারুরূপে তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথচ প্রভুর তিরো-ভাবের কোন কথাই তাহাতে নাই—চৈতন্যভাগবতেও তদ্রূপ। ইহাতে এই অনুমান হয়, প্রভুর তিরোভাবের কোন কথা উল্লেখ করিতে লীলা-লেখক বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস মহাজনগণ মর্মান্তিক ক্লিষ্ট হইতেন। তাঁহারা উভয়েই গৌরগত-প্রাণ। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি সবদা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। মহাপ্রভু যে লীলা শেষে অন্তর্ধান করিয়াছেন—এ চিন্তা তাঁহাদের মনে উদিত হইতেই তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ এবং পরবর্তী লীলালেখকগণ তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ধারণা করাই কঠিন। তাঁহারা অন্য দেবতা জানিতেন না—প্রভুই তাঁহাদের ঠাকুর, দেবতা—হৃদয়-সর্বস্ব। তাঁহাদের দাস্যভাবের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। ' ভকে তাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সে প্রেম, সে ভালবাসার তুলনা নাই, সংসারের কোন সম্বন্ধ তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, প্রভুর সহিত তাঁহার প্রাণোপম ভক্তগণেরও সেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। াই লীলার স্থানে স্থানে দেখা যায়—নীলাচল কিম্বা বৃন্দাবন পথে কোন ভক্তকে প্রভু নিজ সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইযা ভূমিতলে পড়িতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গৌরগত প্রাণ মহাশয় ব্যক্তির পক্ষে প্রভুর তিরোধানের কোন বিষাদকাহিনী বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল না। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মহাগ্রন্থে এই কারণেই বোধ হয় প্রভুর তিরোধানের কোন কথাই নাই। প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে কোন উল্লেখ না থাকাতে মহাপ্রভুর তিরোভাবের অনেক রকম কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তীর মূল কোথায় এবং তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমরা কেবল লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে" প্রভুর অপ্রকটের বিবরণ পাই। "চৈতন্যমঙ্গল" গৌরলীলার এক অপূর্ব গ্রন্থ—মুরারি গুপ্তের কড়চাই তাহার ভিত্তি। মুরারি গুপ্ত প্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত ও সহচর। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া লীলা

লিখিয়াছেন, কাজেই চৈতন্যমঙ্গলও কম প্রামাণিক নহে। কিন্তু সমস্যার বিষয় এই, মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যেও প্রভুর তিরোভাবের কোন বিবরণ নাই। লোচনদাস ঠাকুর তৎকৃত চৈতন্যমঙ্গলে যে বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি কি, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। তবে চৈতন্যমঙ্গল মহাপ্রভুর লীলার অব্যবহিত পরবর্তী। খণ্ডবাসী নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের মরমী ভক্ত। লোচনদাস এই সরকার ঠাকুরের চরণাশ্রিত ছিলেন। "চৈতন্যমঙ্গল" প্রণয়ন করিয়া লোচন নরহরি সরকারকে গ্রন্থ প্রদান করেন। তিরোভাব সম্বন্ধে যদি প্রকৃত বিবরণ যথাযথ বিবৃত না হইত, তবে নরহরি তাহা কখনই অনুমোদন করিতেন না। নরহরি নিশ্চয়ই প্রভুর অপ্রকটের সমুদয় তত্ত্বই অবগত ছিলেন। কাজেই চৈতন্যমঙ্গল যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা হওয়া সঙ্গত নয়। আমরা সেই কাহিনীই উল্লেখ করিলাম।

প্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের স্মৃতি তাহাকে সবদা উন্মনা করিয়া রাখিয়াছে।

"করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত্ত।"

প্রভুর তিরোধানের কাল নিকটবর্তী হইয়াছে, কিন্তু ভক্তগণ এমন কি রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি অতি মরমী নিত্য সহচরগণও তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। কাশী মিশ্রের গৃহে নিত্য যেমন প্রভু সঙ্গে ভক্তগণের আনন্দের হাট বসিয়া থাকে, আলোচ্য দিনেও সেইরূপ বসিয়াছে। প্রভু ব্যথিত অন্তরে ভক্তগণের নিকট বৃন্দাবন কথা কহিতেছেন। হঠাৎ—

"নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥"

নিজ নিত্য সঙ্গীরা প্রভু সঙ্গে দর্শনে যাইতেন—সেদিনও তদ্রূপ চলিলেন। প্রভু ভক্তগণকে বাহিরে রাখিয়া সত্বর মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

আষাঢ় মাস—সপ্তমী তিথি, রবিবার—বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভু মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র মন্দিরে কপাট পড়িল। ভক্তগণ আর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা বড আশ্চর্য হইলেন। এক অজানিত আশঙ্কায় তাঁহারা অভিভূত হইলেন। ভক্তগণের

বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। প্রভু গরুড়ের নিকট থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন—কখনও অগ্রসর হইতেন না। তিনি সেদিন যেন জগন্নাথদেবের শ্রীমুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভু একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ক্রমে জগন্নাথের অতি নিকটবর্তী হইলেন। অতঃপর কি হইল, চৈতন্যমঙ্গলের ভাষাতেই বলিব—

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥" (চৈতন্যমঙ্গল)

এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ঠাকুর কি কি বলিয়া সত্বর আগমন করিলেন—দ্বার উন্মুক্ত হইল। বিপ্র ভক্তগণকে বলিলেন—

"গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন॥
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥"

হাহাকার করিয়া ভক্তগণ ভূমিতলে পতিত হইলেন। কেহ সংজ্ঞাহীন, কেহ বা উঠিলেন, কেহ আর উঠিলেন না—প্রভুর সঙ্গে মহাযাত্রা করিলেন।

"উৎকলের সবে কান্দে ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।"

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মূর্ছিত। পরিকর পরিজনসহ রাজা প্রতাপরুদ্র অচেতন। পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্বভৌম প্রভু প্রভু বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সে আর্তি—সে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন মানুষের দুর্বল লেখনী আর কি বর্ণনা করিবে?

আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—নীলাচল চিরদিনের জন্য বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

॥ "জয় গৌরহরি" ॥